স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

২য় বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি ১৩ - মার্চ ১৩

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী

ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু

ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়

ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস

প্রচ্ছদ ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে

ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয় ২

চিঠিপত্র ৫৩

শরীর

হার্নিয়া ❑ ডা. সুজয় বালা ও ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী ৩

কান থেকে পূঁজ পড়ে? ❑ ডা. সুশীল কুমার সিট ৫

মূত্রপথে সংক্রমণ ❑ ডা. অলোক হালদার ৭

চিকেন পক্স ও তার প্রতিষেধক ❑ ডা. শুভঙ্কর মুখার্জি ৯

রক্ত নিয়ে ❑ ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় ২১

এইডস নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর ❑ ডা. পি কে দাস ২৫

জননতন্ত্র ও যৌনাঙ্গের রোগ ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৩১

মেনোপজ এবং কিছু সংস্যা ❑ ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস ৪২

মন

বয়ঃসন্ধি : সমস্যা ও সমাধান ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ১৯

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সমাজ

ধর্ষণের প্রজাতন্ত্র ❑ সত্য সাগর ৪৭

স্বাস্থ্য : ব্যবস্থা-অব্যবস্থা

মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও নাগরিক স্বাস্থ্য ❑ ডা. অনিরুদ্ধ কর ৩৪

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা ❑ বাবু সাহা ৩৮

ভোপাল

ভোপাল—বিষে আক্রান্ত দ্বিতীয় প্রজন্ম ❑ ডা. শর্মিলা মল্লিক ১১

গবেষণা থেকে গণ আন্দোলনে ❑ ডা. জ্যোতির্ময় সমাজদার ১২

ভোপাল : মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের অধিকার ❑ সতীনাথ সারঙ্গী ১৬

স্মরণে

দীপংকর চক্রবর্তী ৬০

মনতোষ মন্ডল ৫২

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

মেলোড্রামার খপ্পরে ডাক্তারবাবু ❑ অংশুমান ভৌমিক ৪৫

ক্যুইজ

অভিষেক দাস ১০

সম্পাদকীয়

১

কিছুদিন আগে অমর্ত্য সেন বলেছেন, প্রাইভেট চিকিৎসার সাহায্যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যাবে—এমন ভাবাটাই এক ‘ব্যয়সাপেক্ষ ভ্রান্তি’, প্রাইভেট স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেবল ধনীদের জন্য। তাঁর কথায়, ‘‘অন্যান্য দেশ সামনে এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ... জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থাকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ ছিল সেটা হয়নি, আর এখন প্রাইভেট স্বাস্থ্যব্যবস্থা কোনভাবে এসে তার ফুটোফাটাগুলো মেরামত করে দেবে—এই ভয়ানক ব্যয়সাপেক্ষ ভ্রান্তিতে ভোগা হচ্ছে।’’

কথাটা না মেনে উপায় নেই। আমাদের দেশ না হয় স্বাস্থ্যখাতে খরচ খুব কম করে, কিন্তু আমেরিকা আর ব্রিটেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক একটা ছবি আমরা দেখেছি **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র গত সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৩)। ব্রিটেনের তুলনায় অনেক কম খরচে প্রায় সবাইকে স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। আমেরিকায় মাথাপিছু স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বছরে ৭২৯০ ডলার। ব্রিটেনে সেই ব্যয় মাত্র ২৯৯২ ডলার। অথচ নানাবিধ পরিষেবার গুণমান যদি বিচার করা যায়, ব্রিটেনের স্থান দু-নম্বরে রাখলে, আমেরিকাকে রাখতে হবে সাত-নম্বরে। ভুলে গেলে চলবে না, ব্রিটেনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল স্তম্ভ যেখানে সরকারি (National Health Service বা এন এইচ এস) চিকিৎসা, সেখানে আমেরিকায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রাইভেট, আর তার টাকা দেয় প্রাইভেট বিমা কোম্পানি; খুব গরীব আর বয়স্কদের জন্য রয়েছে সরকারি বিমা, কিন্তু চিকিৎসা সেই প্রাইভেট হাসপাতালে। ১৯৪৭-এর পর আমাদের দেশে অনেকটা ব্রিটিশ এন এইচ এস ধাঁচে সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি প্রাইভেট চিকিৎসাব্যবস্থা চলছিল। ব্রিটেনে এন এইচ এস তৈরি করার সময় এই ধরনের মিশ্র ব্যবস্থাকে খারিজ করা হয়েছিল। তাঁরা তখনই বুঝেছিলেন সরকারি ও প্রাইভেট দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চললে সরকারি ব্যবস্থা সবসময়েই হবে যেন দয়ার দান, গরীবদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা। ব্রিটিশদের সে-আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না ভারতবর্ষ তা প্রমাণ করে দেখাল। এখন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল খারাপ — এই অজুহাতে গোটা চিকিৎসাব্যবস্থাটা প্রাইভেট হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেবল সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাই যে গরীবকে সামান্য হলেও খানিকটা পরিসর দিয়েছে, আর একটু ভাল করে চালালে এ-ব্যবস্থাকে যে অনেকটা উন্নত করা যায়, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পাতায় সেটা আমরা বারবার দেখছি, এই সংখ্যায় আবার দেখব।

প্রাইভেট চিকিৎসা চকমকে হতে পারে, কিন্তু তা গরীবদের জন্য নয়, অন্তত ছিল না এতোদিন। এই সংখ্যায় আমরা দেখব, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-র মাধ্যমে গরীবের হাতে সরকারি টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি সেই পয়সায় প্রাইভেট চিকিৎসা খানিকটা কিনতে পারেন। এই ভাবে গরীব মানুষ চিকিৎসার কিছুটা সুযোগ পাবেন, এবং একই সাথে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও বেশি অপ্রয়োজনীয় ও অদক্ষ বলে প্রমাণিত হবে। ২০১২-১৩ সালে সরকার ১০৯৬ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার জন্য খরচ করছেন, এই খরচ প্রতি বছর বাড়তে থাকবে। জনগণের এই পয়সা প্রাইভেট চিকিৎসার পিছনে না ঢেলে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অনেকটা জোরদার করা যেত। সেটা কেউ বলছেন না।

২

আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আমাদের জন্য নীতি-প্রণয়ন ঠিকঠাক করেন, গলদ রয়েছে সে নীতির প্রয়োগে, আর চুরি বাটপাড়ি দূর করতে পারলে এপথেই মোক্ষলাভ হবে—এমন ধারণা খুব বিরল নয়। সরকারি নীতিগুলো যে সবসময়ে মানুষের কথা ভেবে ঠিক করা হয় না, আর জনসাধারণের চাপে সে-নীতি খানিক বদলানো যায়—আমরা বোধকরি ভোপাল থেকে এইটুকু শিক্ষা নিতে পারি। এইবার **স্বাস্থ্যের বৃত্তে** ভোপালের গ্যাসকান্ড আর তার পরে মানুষের ধারাবাহিক লড়াই নিয়ে লিখেছেন সেখানকার আন্দোলনের এক প্রধান সংগঠক, ভোপালের গ্যাস-পীড়িতদের চিকিৎসার ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় যুক্ত এক চিকিৎসক-সংগঠক, এবং এক চিকিৎসক। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য যে সমাজনীতি-রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বোঝা সম্ভব নয়, সেটা তাঁদের চেয়ে স্পষ্ট করে কেউ বোধকরি হৃদয়ঙ্গম করেন নি।

এবার শুধু পাঠকের প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

হার্নিয়া

‘হার্নিয়া’ কথাটা আমরা হরবখত বলি। কিন্তু সত্যিই কি আমরা জানি হার্নিয়া বলতে কী বোঝায়, তার লক্ষণগুলো কী, আর চিকিৎসাই বা কী? লিখছেন **ডা. সুজয় বালা ও ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জি।**

হার্নিয়া কি?

সাধারণভাবে হার্নিয়া বলতে আমরা শরীরের ভিতরের কোনো অঙ্গ (organ) বা কলা (tissue)-র তাকে ঘিরে থাকা মাংসপেশীর দেওয়ালের দুর্বলতার কারণে অস্বাভাবিক ভাবে বাইরে বেরিয়ে ফুলে থাকাকে বুঝি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় পেটের ভেতরকার কোনো অঙ্গ (যেমন-খাদ্যনালী) পেটের মাংসপেশীর দুর্বলতার কারণে বেরিয়ে এসে ফুলে থেকে।

যে অংশগুলিতে হার্নিয়া মূলত দেখা যায় সেগুলি হল কুঁচকির কাছের অংশ (Inguinal), কুঁচকির নীচে জঙ্ঘার (Thigh) ভিতরের দিকে, নাভি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে, পেটের মধ্যবর্তী রেখা (Linea alba) সংলগ্ন অঞ্চলে এবং কোনো পূর্ববর্তী অপারেশনের জায়গায়।

এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আমরা যে হার্নিয়ার মুখোমুখি হই, তা মূলত কুঁচকির কাছের হার্নিয়া বা ডাক্তারি পরিভাষায় ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া (Inguinal Hernia)।

> সর্বাপেক্ষা বেশি আমরা যে হার্নিয়ার মুখোমুখি হই, তা মূলত কুঁচকির কাছের হার্নিয়া বা ডাক্তারি পরিভাষায় ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া

দেহের অঞ্চল-বিশেষে বিভিন্ন ধরনের হার্নিয়া বিভিন্ন ভাবে ও ভিন্নভিন্ন উপসর্গ সহকারে দেখা যায় এবং তাদের চিকিৎসা মূলত অপারেশন হলেও এই অপারেশনগুলিও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে করতে হয়।

আমাদের আজকের আলোচনাকে মূলত আমরা কুঁচকির হার্নিয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখব।

কি হয় এই Inguinal Hernia তে?

কুঁচকির কাছে পেটের মাংসপেশীর দুর্বলতার কারণে খাদ্যনালীর খানিকটা অংশ বেরিয়ে এসে অন্ডথলি ও তৎসংলগ্ন অংশে ঝুলে থাকে বা ফুলে থাকে।

কাদের হয়?

দেখা গেছে যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

রোগের গতিপ্রকৃতি

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ফোলাটা ছোটো থাকে। সময়ের সাথে সাথে ফোলা বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ে অনেক সময়ই কাশি হলে, দাঁড়িয়ে পড়লে, মলত্যাগের সময় জোর দিলে তবেই ফোলাটা স্পষ্ট হয়; শুয়ে পড়লে ফোলা মিলিয়ে যায় বা অনেকটাই কমে যায় এবং খাদ্যনালীর এই বেরিয়ে থাকা অংশ হাত দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়েও দেওয়া যায়।

এই অবস্থায় যদি চিকিৎসা না করিয়ে ফেলে রাখা হয়, তাহলে ফোলাটা বড় আকার ধারণ করে এবং শুয়ে পড়লেও ফোলা কমে না বা হাত দিয়ে খাদ্যনালী পেটের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে অপারেশন প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রোগীর কিছু আনুষঙ্গিক সমস্যা থাকলে রোগের প্রসার দ্রুত হয়। এগুলির মধ্যে ধূমপান, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রস্টেটের বৃদ্ধিজনিত পেচ্ছাপের সমস্যাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিপদটা কোথায়?

রোগ দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে অর্থাৎ চিকিৎসা না করালে খাদ্যনালীর যে অংশ বেরিয়ে এসেছে তাতে বাধার (obstruction) সৃষ্টি হয়, এই অংশে রক্তসঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। তীব্র ব্যথা হতে পারে। এমনকি খাদ্যনালীর এই অংশে পচনও ধরতে পারে। এতে রোগীর জীবনহানির সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেড়ে যায়।

চিকিৎসা

চিকিৎসার ব্যাপারে একটা বিষয় প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন, কোনোরকম হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও প্রাণায়ম দ্বারা এর প্রতিকার সম্ভব নয়। উল্টে এসব করে সময় নষ্ট করে যখন রোগী শল্যচিকিৎসকের কাছে পৌঁছান, ততদিনে রোগ বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। তখন অপারেশনের পদ্ধতিও জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

> এতে রোগীর জীবনহানির সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেড়ে যায়।

বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় অপারেশনের মাধ্যমে খাদ্যনালীকে পেটের মধ্যে পুনঃপ্রতিস্থাপিত করা হয় এবং পেটের মাংসপেশীর দুর্বলতা ঠিক করার জন্য সেই অংশে জালি (mesh) বসিয়ে দেওয়া হয়। এই জালির দাম মোটামুটি ১০০০ টাকার মতো।

> এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন, কোনোরকম হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও প্রাণায়ম দ্বারা এর প্রতিকার সম্ভব নয়।

এখনও বিভিন্ন মফঃস্বল ও গ্রামেগঞ্জে জালি না বসিয়ে অনেক চিকিৎসকই অপারেশন করেন। কিন্তু এর ফলে বিশেষত বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে হার্নিয়া আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জালি বসিয়ে অপারেশন করা হলে এই সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যায়।

অপারেশনের পর রোগীকে ২দিন হাসপাতালে

থাকতে হয়। সাধারণত অপারেশনের ৭ দিনের মাথায় সেলাই কাটা হয়। এই পুরো সময়টাই অপারেশনের জায়গাটা পভিডোন আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। অপারেশনের ৭-১০ দিন পর সাবান দিয়ে স্নান করা যায় এবং অপারেশনের জায়গাটা ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়। না হলে সেখানে সংক্রমণ হবে এবং তাতে রোগীর ভোগান্তি আরও বাড়বে। এই সময়টা রোগীকে ভারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কাশি ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে তা দূর করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

কিছু ভুল ধারণা

অপারেশনের জায়গাটা যেহেতু যৌনাঙ্গের কাছাকাছি, তাই অনেকেই ভয় পান যে অপারেশন করালে তিনি হয়তো যৌনসঙ্গমে অক্ষম হয়ে পড়বেন। বাস্তবত এই অপারেশনে তার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না এবং এই ভয় নিতান্তই অমূলক।

বাচ্চাদের হার্নিয়া

বাচ্চাদের হার্নিয়া পেটের মাংসপেশীর দুর্বলতার জন্য হয় না। বাচ্চা মায়ের পেটে থাকার সময় Processus vaginalis নামক এক প্রকার নালী বাচ্চার পেটের ভিতর থাকে, যা জন্মের পর অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই নালী অবলুপ্ত না হয়ে, থেকে গেলে কুঁচকির কাছে বেরিয়ে এসে ফোলার আকারে থেকে যায়। এটার জন্যই বাচ্চাদের হার্নিয়া হয়।

বাচ্চার জন্মের সময় থেকেই এই হার্নিয়া থাকে। বাচ্চা কান্নাকাটি করলে বা খেলার সময় ফোলাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ফোলাটা ঠেলে পেটের মধ্যে ঢোকানো যায় না। বাচ্চা শুয়ে পড়লে ধীরে ধীরে এই ফোলা কমে যায়।

এক্ষেত্রেও রোগের চিকিৎসা না করিয়ে ফেলে রাখা ঠিক নয়। বাচ্চাদের হার্নিয়ার চিকিৎসাও অপারেশন ছাড়া হয় না। কিন্তু যেহেতু পেটের মাংসপেশীর কোনো দুর্বলতা বাচ্চাদের থাকে না, তাই এই অপারেশনে জালি (mesh) বসানোর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র Processus vaginalis নামক নালীটা কেটেই অপারেশন (herniotomy) করা হয়।

শেষ কথা হার্নিয়া রোগটা বহু মানুষের হয়। আর এটা কোনও ভয়াবহ রোগ নয়, অপারেশন করলে দিব্যি পুরো সুস্থ হয়ে ওঠা যায়। অপারেশনের ভয়ে চিকিৎসা না করিয়ে ফেলে রাখলে বিপদ, এটা সেটা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় হার্নিয়া সারে না। অপারেশন করালে পুরনো পদ্ধতিতে না করিয়ে আধুনিক পদ্ধতি ‘মেশ’ (mesh) বা জালি স্থাপন করিয়ে অপারেশন করা অনেক ভাল।

লেখক পরিচিতি : ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জি, এম বি বি এস, একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও যুক্ত। ডা. সুজয় বালা, এমবিবিএস, এম এস, ডি এন বি, বর্তমানে ক্যানসার সার্জারির প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কান থেকে পূঁজ পড়ে?

অবহেলা করবেন না—বিপদ হতে পারে

ডা. সুশীল কুমার সিট

ঘটনা - ১ : পাঁচ বছরের বাচ্চা। ঘন ঘন সর্দিকাশিতে ভোগে। সর্দি হলেই কান থেকে পূঁজ পড়ে। আরও দুটি সন্তানকে নিয়ে মায়ের অবস্থা নাজেহাল। বাবা রিক্সা চালান। অভাবের সংসারে ছোট্ট এক চিলতে ঘরে পাঁচ জন গাদাগাদি করে থাকেন। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছেলের চিকিৎসা নিয়ে ভাববেন কি করে?

ঘটনা - ২ : বারো বছরের ছেলেটি ক্লাস সেভেনে পড়ে। গ্রামের গরীব চাষি পরিবারের ছেলে। পড়াশুনায় অসম্ভব ভাল। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পড়াশুনায় সে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। মনে হয় যেন কিছুটা অমনোযোগী। মাস্টার মশাই বলছেন যে ছেলেটি কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। বাবা-মা'র থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ছোটবেলায় কান থেকে পূঁজ পড়ত।

ঘটনা - ৩ : ষোলো বছরের কিশোর ছেলেটি খুবই দুরন্ত। সারাবছর পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করাই তার অভ্যাস। ছোট থেকেই কানে পূঁজ। বাবা-মায়ের অবহেলার কারণে ভালভাবে চিকিৎসা কোনদিনই হয়নি। একদিন শুরু হল প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা, তার সঙ্গে বমি এবং খিঁচুনি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী শহরের বড় হাসপাতালে আনা হল। সেখানে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুকে দেখানো হল। তিনি বললেন কানের পর্দা ফুটো। তা থেকে মস্তিষ্কে পূঁজ জমেছে। এখুনি ভর্তি করাতে হবে। অপারেশন প্রয়োজন।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে কারণ একটাই। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় সি এস ও এম বা 'ক্রনিক সাপ্যুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া'। চলতি কথায় কানের পর্দা ফুটো রোগ।

রোগটা কিভাবে হয় একটু জেনে নেওয়া যাক। আমাদের কর্ণকুহর আসলে একটা কানাগলি। গলির বাইরের মুখটা খোলা এবং ভিতরের মুখটা পর্দা দিয়ে বন্ধ থাকে। পর্দার পিছনে আছে একটা ছোট্ট চোরাকুঠুরি। সেটাই আসলে মধ্যকর্ণ। সেখান থেকে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ নেমে এসেছে নাসিকা গহ্বরে। এই সুড়ঙ্গটির নাম ইউস্টেশিয়ান টিউব। এর মাধ্যমেই কানের পর্দার বাইরের এবং ভিতরের দিককার বায়ুচাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। এই টিউবটির নাসিকা গহ্বরের প্রান্তমুখে একটা ছোট্ট মাংসপেশী আছে। ঠিক যেন সুড়ঙ্গের মুখে প্রস্তরখন্ড।

ঢোক গেলা, খাবার চিবানো, খাবার গলাধঃকরণ করা, কথা বলা এবং হাই তোলা ইত্যাদির ফলে ঐ মাংসপেশীর সংকোচন হয়। ফলে 'চিচিং ফাঁক' এবং 'চিচিং বন্ধ'-এর মত সুড়ঙ্গমুখ খোলা-বন্ধ হয়। ঘন ঘন সর্দিকাশি হয়ে নাক বন্ধ থাকলে ঐ টিউবটিও দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। তখন মধ্যকর্ণের ভিতরের বায়ু শোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সেখানে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ মধ্যকর্ণের রক্তজালিকা থেকে তরল পদার্থ নিঃসরণ হয় এবং প্রদাহ সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে ঐ তরল পদার্থ জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। ভিতরের তরল পদার্থের চাপে পর্দার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে ছিদ্র সৃষ্টি হয়। ঐ ছিদ্র পথে তরল পদার্থ বাইরে নির্গত হয়। আমরা তাকে বলি সি এস ও এম বা চলতি কথায় কানের পর্দা ফুটো রোগ। পুকুরের নোংরা জলে স্নান করা এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে সংক্রমণের মাত্রা বেড়েই যায়। ফলে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়।

কী কী কারণে কানের পর্দাফুটো রোগ হতে পারে?

(১) অ্যালার্জি, জীবাণু সংক্রমণ, কিংবা তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন নাকের ভিতরে সর্দি হলে ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ হতে পারে। ফলস্বরূপ কানের পর্দা ফুটো রোগ হতে পারে।

(২) প্রধানত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 'অ্যাডিনয়েড' নামক এক প্রকার লসিকাগ্রন্থি নাক ও খাদ্যনালীর সংযোগস্থলে থাকে। অ্যাডিনয়েডের আকার বৃদ্ধি ও জীবাণু সংক্রমণের ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ হতে পারে।

(৩) টনসিলাইটিস এবং অত্যন্ত বড় সাইজের টনসিল ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধের কারণ হতে পারে।

(৪) নাকের ভিতরের কোনও টিউমার বা ক্যান্সারও ঐ রোগের সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৫) জন্মগত কারণে মুখের ভিতরের তালু দ্বিখন্ডিত থাকলে ইউস্টেশিয়ান টিউবের খোলা-বন্ধের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ফলস্বরূপ কানের পর্দা ফুটো রোগ হতে পারে।

(৬) এরোপ্লেনে অতি দ্রুত অবতরণের সময় বায়ুচাপের তারতম্যের ফলে ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সময়োপযোগী চিকিৎসা না হলে পর্দা ফুটো হয়ে যেতে পারে।

(৭) আঘাতের ফলে অনেক সময় পর্দা ফুটো হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ফুটো নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কোনও কারণে জীবাণু সংক্রমণ হয় তাহলে সি এস ও এম রোগ হয়ে যেতে পারে।

রোগের প্রকারভেদ ও জটিলতা :

কানের পর্দা ফুটো রোগ প্রধানত দুই প্রকারের। একটি নিরাপদ প্রকৃতির, ডাক্তারি পরিভাষায় নাম 'টিউবো-টিম্প্যানিক'। এতে জটিলতার সম্ভাবনা

খুব কম। অন্যটি বিপজ্জনক প্রকৃতির, ডাক্তারি পরিভাষায় 'অ্যাটিকো-অ্যান্ট্রাল'। এতে প্রায়শই নানারকম জটিলতা দেখা যায়।

এখন দেখে নেওয়া যাক্, এই রোগে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে—

(১) কানের পিছনে 'ম্যাস্টয়েড' নামক একটি অস্থিখন্ডের মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। তখন ঐ অস্থিটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পূঁজ জমে যায়।

(২) মধ্যকর্ণের ভিতরে অস্থি-সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থানকারী 'ফেসিয়াল নার্ভ' নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মুখ বেঁকে যায়।

(৩) মধ্যকর্ণ থেকে সংক্রমণ অন্তঃকর্ণে পৌঁছে যায়। ফলস্বরূপ মাথা ঘোরা, বমি, কানে ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ এবং বধিরতার সৃষ্টি হয়।

(৪) মস্তিষ্কের আবরণীতে জীবাণু সংক্রমণ বা মেনিনজাইটিস হতে পারে।

(৫) মাথার খুলির ভিতরে, মস্তিষ্কের আবরণীর বিভিন্ন স্তরে, এমনকি মস্তিষ্কের মধ্যেও পূঁজ জমে 'অ্যাবসেস' হতে পারে।

উপরোক্ত জটিলতাগুলির ক্ষেত্রে সময়োপযোগী চিকিৎসা না হলে রোগীর প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

চিকিৎসা : নিরাপদ প্রকৃতির এবং জটিলতাহীন পর্দা ফুটো রোগের ক্ষেত্রে অনেকসময় অ্যান্টি-বায়োটিক, কানের পূঁজ পরিষ্কার করে কানের ফোঁটা ওষুধ এবং সর্দি কমানোর ওষুধ ব্যবহার করে কানের পূঁজ পড়া বন্ধ করা যায়। ফলে প্রাথমিকভাবে রোগকে দমন করা যায়। পরে 'টিম্প্যানোপ্লাস্টি' নামক মাইক্রোসার্জারির সাহায্যে ফুটো পর্দা জোড়া লাগানো যায়। বিপজ্জনক প্রকৃতির এবং জটিলতাযুক্ত পর্দা ফুটো রোগের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট না করে অতি শীঘ্র সংক্রমণ দমন করে 'ম্যাস্টয়েডেক্টমি' অপারেশন করা হয়। যদি মস্তিষ্কে পূঁজ জমে তাহলে নিউরোসার্জেনের সহযোগিতায় ঐ পূঁজ বার করা হয়। একই অপারেশনে অথবা পরবর্তী অপারেশনে 'টিম্প্যানোপ্লাস্টি'র সাহায্যে পর্দা ফুটো জোড়া লাগানো হয়।

রোগ নিবারণের ক্ষেত্রে রোগীর আর্থসামাজিক অবস্থার প্রভাব : সি এস ও এম বা কানের পর্দা ফুটো রোগকে অতি সহজেই দরিদ্র বা আর্থসামাজিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই কানের পর্দা ফুটো রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আলো হাওয়া যুক্ত বাসস্থানের অভাবের দরুন বারবার সর্দিকাশি এবং ভাইরাস সংক্রমণ হতে থাকে। অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাবে এঁরা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন না। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করেন। এর ফলে কানের পর্দা ফুটো রোগ আরও জটিল আকার ধারণ করে। সর্বোপরি, অর্থাভাব এবং সুযোগের অভাবে বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে এঁরা বঞ্চিত হন। ফলে, সাধারণ সর্দিকাশি অতি সহজেই কানের পর্দা ফুটো রোগে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে সি এস ও এম বা কানের পর্দা ফুটো রোগটির মূল কারণ সমাজব্যবস্থার অনেক গভীরে প্রোথিত আছে। এইসব মৌলিক সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব নয় ভেবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে অন্ততঃ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কাজটা করতে পারলে সেটাই বা মন্দ কি!

লেখক পরিচিতি : ডা. সুশীল কুমার সিট, এম বি বি এস; ডি এল ও, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ এবং একটি সরকারি মেডিকাল কলেজের শারীরবিদ্যার শিক্ষক)।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হয়েছে একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

মূত্রপথে সংক্রমণ

কিডনি তথা বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়, আর পেটের মধ্যে দুটো নল (ইউরেটার) দিয়ে তা নেমে আসে তলপেটের ভেতরে মূত্রথলিতে, তারপর মূত্রনালী দিয়ে বেরিয়ে যায় দেহের বাইরে। প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ হল ইউরেটার থেকে মূত্রনালী পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় সংক্রমণ। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সবসময়ে তা চেনা শক্ত, লম্বা চিকিৎসা দরকার হতে পারে; তবে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই—লিখছেন **ডা. অলোক হালদার**।

সায়কের কথা (১৯৮৭) : আমার ছেলে ৩ বছরের সায়ক কয়েকদিন ধরে খুব দুষ্টুমি করছে। যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘনঘন প্রস্রাব করছে, কতো বোঝাচ্ছি, বকছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কৃমির ওযুধও খাওয়ালাম, কিছুই হচ্ছে না। অগত্যা আমাদের পাড়ার খগেন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে উনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন। ৩/৪ দিন খাওয়াতেই ব্যাপারটা মিটে গিয়েছিল, কিন্তু ১২ দিন পরেই আবার একই লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। এবার জ্বরও এসেছে আর প্রস্রাব করার সময় জ্বালা, তলপেট ব্যথা বলছে। খগেন ডাক্তারবাবু অন্য একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন। তিনচার দিন ধরে খাওয়াচ্ছি কিন্তু কিছুই কমছে না। গতরাতে খুব জ্বর আর তলপেট ব্যথা হয়েছে, সারারাত ঘুমায়নি। খগেন ডাক্তারবাবুর কথামতো এবার একজন শিশু-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে উনি অন্য ইঞ্জেকশন দিলেন ১০ দিনের জন্য, তার ওপর আবার রক্ত, প্রস্রাব পরীক্ষা ও পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করাতে বললেন। দু'দিন ইঞ্জেকশন দিতেই জ্বর ব্যথা সবই কমে গেছে। তাই ভাবছি মিছিমিছি অতগুলো টাকা খরচা করে পরীক্ষাগুলো করাবো কেন? থাক, পরে দেখা যাবে।

ঠিক এমনটাই সাধারণত বাচ্চাদের প্রস্রাবের রাস্তার সংক্রমণ (ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা UTI) রোগের প্রথমবারের গল্প

—ঠিক এমনটাই সাধারণত বাচ্চাদের প্রস্রাবের রাস্তার সংক্রমণ (ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা UTI) রোগের প্রথমবারের গল্প। সবসময় প্রস্রাবের সমস্যা নাও থাকতে পারে। যেমন, ২ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে হঠাৎ জ্বর, খিটখিটে হয়ে যাওয়া, ভালো করে না খাওয়া (ক্ষুধামান্দ্য), ঘনঘন বমি হওয়া, কষা পায়খানা ইত্যাদি লক্ষণও দেখা যায়।

কি করা উচিৎ?

বাচ্চার প্রস্রাবের সংক্রমণ বুঝলে (উল্লিখিত লক্ষণগুলো থাকলে) অথবা সাধারণ কোনও কারণ ছাড়া (যেমন সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, পাতলা পায়খানা, ইত্যাদি) জ্বর থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অথবা প্রস্রাব বা রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি না করে অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না।

মূত্র তন্ত্রের সংক্রমণ কিভাবে বুঝবো?

জীবাণুমুক্ত পাত্রে প্রস্রাব করার মাঝামাঝি সময়ের মূত্র (midstream urine) সংগ্রহ করে পরীক্ষা করালে প্রাথমিকভাবে যদি প্রস্রাবে সাদা কোষের (pus cell বা শ্বেত রক্তকণিকা) সংখ্যা প্রতি মিলিমিটারে ৫ বা তার বেশি হয় তবে সংক্রমণ সন্দেহ করা হয়। এরপরে প্রস্রাব কালচার সেনসিটিভিটি পরীক্ষা করিয়ে যদি প্রতি মিলিমিটার মূত্রে ১ লক্ষের বেশি ক্ষতিকারক জীবাণু পাওয়া যায় তবে নিশ্চিতভাবে মূত্রের সংক্রমণ বলা যায়। ২ বছরের কম বয়সের বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রতি মিলি লিটারের মূত্রে ৫০ হাজারের বেশি জীবাণুর সংখ্যা হলে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় এবং চিকিৎসা শুরু করা হয়।

কী কী জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ হয়?

শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রথমবার সংক্রমণে এবং শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে বারবার সংক্রামণে সাধারণত E. coli, Klebsiella, Staphylococcus epiermidis / fecalis এবং enterococci জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায়। হাসপাতালে ভর্তি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে Proteus, Pseudomonus জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণ হয়। Proteus নামক জীবাণু দ্বারা বড় বাচ্চাদের সংক্রমণ হলে সেক্ষেত্রে মূত্রনালীতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অন্যান্য কী কী পরীক্ষা করা উচিৎ?

একবার প্রস্রাব পরীক্ষায় সংক্রমণ ধরা পড়লে পরবর্তী অন্যান্য পরীক্ষার জন্য সাধারণত যে গাইডলাইন (নির্দেশাবলী) ব্যবহার করা হয় তা হল—

বয়স	পরীক্ষা
১ বছরের কম শিশুদের জন্য	● মূত্রতন্ত্রের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ● প্রস্রাব করাকালীন মূত্রতন্ত্রের বিশেষ এক্সরে ছবি ● DMSA কিডনি স্ক্যান
১ থেকে ৫ বছরের শিশুদের জন্য	● আলট্রাসোনোগ্রাফি ● DMSA স্ক্যান— যদি স্বাভাবিক না হয় তবে প্রস্রাব করাকালীন মূত্রতন্ত্রের বিশেষ এক্সরে ছবি।
৫ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য	আল্ট্রাসোনোগ্রাফি — যদি অস্বাভাবিক হয় তবে, উপরোক্ত বিশেষ এক্সরে ও এবং DM A স্ক্যান।

প্রসঙ্গত, বারংবার প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ হলে বয়স যাই হোক না কেন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, প্রস্রাব করাকালীন বিশেষ এক্সরে ছবি ও DMSA স্ক্যান ইত্যাদি সব পরীক্ষাই করা উচিত।

কেন এসব জটিল পরীক্ষা করাবো ?

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি'র বিশেষজ্ঞরা এইসব পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন কারণ—

● আমাদের দেশে বাচ্চা পেটে থাকাকালীন নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সবকিছু হয় না, ফলত মূত্রতন্ত্রের জন্মগত কোনও অস্বাভাবিককতা থাকলে তা জানা যায় না।

● প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে অনেক ক্ষেত্রেই তার সঠিক সময়ে চিকিৎসা হয় না অথবা আধা চিকিৎসা হয় এবং তার ফলে পরবর্তীকালে বৃক্কের ক্ষত (scarring), VUR (মূত্রথলি থেকে বৃক্ক পর্যন্ত উল্টোদিকে মূত্র জমে যাওয়া), উচ্চ রক্তচাপ হওয়া এবং বৃক্কের ধীরে ধীরে পাকাপাকিভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বাভাবিক মূত্রতন্ত্র

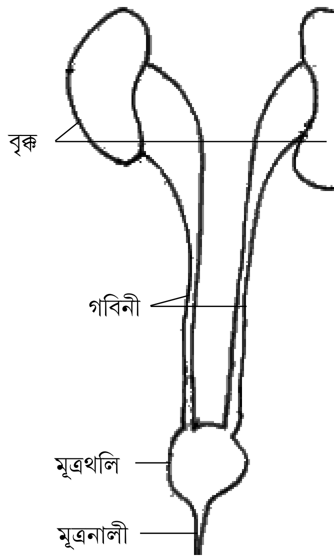

M.C.V. পরীক্ষা করলে VUR যেমন দেখা যায়- ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ইউরেটারে (বৃক্ক থেকে মূত্রথলি পর্যন্ত যে মূত্রনালী) প্রস্রাব জমে সেই ইউরেটার ফুলে অস্বাভাবিস হয়ে যায় এবং বৃক্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা কি?

সাধারণ মূত্রপথে সংক্রমণের ক্ষেত্রে ৩ মাসের কম বয়সের খুব অসুস্থ শিশুর ধমনীর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রথম ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা চিকিৎসা করা হয়। তারপর বাচ্চা কিছুটা সুস্থ হলে মুখে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো সম্ভব হলে আরও ৭-১০ দিন ওষুধ খাওয়ানো হয়।

৩ মাসের বেশি বয়সের বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই মুখে ওষুধ খাওয়ানো হয় ও তা ৭ থেকে ১৪ দিন চলে।

সবক্ষেত্রেই সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচন করা হয় প্রস্রাবের কালচার সেনসিটিভিটি অনুসারে। কিন্তু সেই রিপোর্ট হাতে পৌঁছনোর আগে এই সংক্রমণের জন্য দায়ী জীবাণু কি হতে পারে ও সেই সময়ে সেসব জীবাণু কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিকে মারা যাবে—সেসব ভেবেচিন্তে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়।

৭-১৪ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার পরেও কম মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে (৬ মাস বা তার বেশি সময়) চিকিৎসা করা হয়।

৭-১৪ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসাই কি যথেষ্ট?

না। অনেক ক্ষেত্রেই ৭-১৪ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার পরেও কম মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে (৬ মাস বা তার বেশি সময়) চিকিৎসা করা হয়। একে বলে 'অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস' (Antibiotic prophylaxis)। এইসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক প্রফাইল্যাক্সিস করা দরকার—

(১) ১ বছরের কম বয়সের শিশুদের প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে যতক্ষণ না আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, DMSA স্ক্যান, বিশেষ এক্সরে ছবি— ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে,

(২) যদি রিপোর্টে VUR দেখা যায়,

(৩) ঘন ঘন (১ বছরে ৩ বারের বেশি) ও জ্বর নিয়ে প্রস্রাবের সংক্রমণ হলে, যদি পরীক্ষায় মূত্রতন্ত্র স্বাভাবিক থাকে তবুও।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইল্যাক্সিস কি ভাবে, কতদিন দেওয়া হয়?

চিকিৎসার বর্তমান গাইডলাইন হল—

- প্রথম ৩-৬ মাস শিশুদের cephalexin জাতীয় ওষুধ।
- ৩ মাসের বেশি বয়সের শিশুদের cotrimoxazole অথবা cephalexin/ cefadroxil / cefixime খুব কম মাত্রায় দেওয়া হয়।

VUR থাকলে—

- Grade I, II এর ক্ষেত্রে—১ বছর পর্যন্ত
- Grade III, IV, V এর ক্ষেত্রে—৫ বছর বয়স পর্যন্ত বা তার বেশি সময় ধরে।

প্রসঙ্গত ঃ ১.৫ বা ২ বছর পরে পরীক্ষা করিয়ে উন্নতির লক্ষণ না থাকলে বা বারংবার সংক্রমণ হলে—

শল্য চিকিৎসা বা এন্ডোস্কোপি করে মূত্রতন্ত্রের অস্বাভাবিকতা সারানো হয়।

সায়কের কথা (২০১৩)

সায়কের বয়স এখন ২৯ বছর, একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ২ বছর আগে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার পরে জানা গেছে তার রক্তচাপ প্রচণ্ড বেশি। এরপর বিভিন্ন পরীক্ষা করে জানা যায় ওর দুটো বৃক্কই ক্ষতিগ্রস্ত, একটি প্রায় অকেজো। এখন নিয়মিত প্রেসারের এবং অন্যান্য ওষুধ খায় এবং কলকাতায় একটি কিডনি হসপিটালের তত্ত্বাবধানে

আপশোসের কথা এই যে সায়কের বাবা-মা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শিশু বয়সে ওর যথাযথ চিকিৎসা করালে ও এখন অনেক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো

নিয়মিত চিকিৎসায় আছে। দুঃখ এবং আপশোসের কথা এই যে—সায়কের বাবা-মা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শিশু বয়সে ওর যথাযথ চিকিৎসা করালে ও এখন অনেক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো।

লেখক পরিচিতি : ডা. অলোক হালদার, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, শিশু রোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

✠ টনিক, ভিটামিন, এনজাইম খেয়ে কোন লাভ হয় না।

চিকেন পক্স ও তার প্রতিষেধক : কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

চিকেন পক্স বা জলবসন্ত নিয়ে আমাদের অত আতঙ্কের মূল কারণ বোধকরি স্মলপক্স বা গুটিবসন্তর সঙ্গে তার নামের মিলটুকুই, কেননা জলবসন্ত মোটেই তেমন মারাত্মক অসুখ নয়। জলবসন্ত হলে কী করবেন, আর তাকে আটকানোর উপায় বা কী, লিখছেন **ডা. শুভঙ্কর মুখার্জী।**

চিকেন পক্স বা জলবসন্ত একটি অতি সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ যা সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বড়দের মধ্যে এই রোগ হলে জটিলতার সম্ভাবনা বাড়ে।

কী থেকে হয় এই রোগ ?

যে ভাইরাস এই রোগের কারণ, তার পোষাকি নাম 'ভ্যারিসেলা-জস্টার' ভাইরাস।

একবার এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে তা দেহ থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে যায় না, এমনকি চিকেন পক্স রোগ নিরাময়ের পরেও শরীরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায়।

ভবিষ্যতে বয়স জনিত বা অন্য কোনো কারণে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে, এই ভাইরাস আবার জেগে উঠে "হারপিস জস্টার" নামক একটি অসুখ সৃষ্টি করতে পারে, যা থেকে স্নায়ুজনিত ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

কিভাবে ছড়াতে পারে এই রোগ?

সাধারণত হাঁচি, কাশির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এই রোগ। আবার অনেক সময় চিকেন পক্সের গুটির ভেতরের জলীয় পদার্থ বা কখনো সখনো হারপিস জস্টারের ঘা-র সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে গেলেও এই রোগ ছড়াতে পারে।

এই রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ কী কী হতে পারে?

প্রথমে জ্বর, শীত শীত ভাব, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ ভাব, ক্ষিদে কমে যাওয়া এবং তার প্রায় ২৪ ঘন্টার মধ্যেই দেখা দেয় ছোট ছোট জলপূর্ণ গুটি বা র‍্যাশ, যা কপালে, মুখে, গা হাত পায়ে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়। কারুর র‍্যাশ কম হয়, আবার কারুর খুব বেশি হয়; বিশেষ করে বড়দের ক্ষেত্রে গুটির সংখ্যা বেশি হয়।

একবার এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে তা দেহ থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে যায় না, এমনকি চিকেন পক্স রোগ নিরাময়ের পরেও শরীরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায়।

কখন এই রোগ সবচেয়ে বেশি সংক্রামক থাকে?

সাধারণত গুটি বা র‍্যাশ আবির্ভূত হওয়ার ১-২ দিন আগে এবং তার ৪-৫ দিন পর পর্যন্ত এই রোগ সংক্রামক থাকে। একবার গুটিগুলি শুকিয়ে গেলে এই রোগ আর সংক্রামক থাকে না।

এই রোগের চিকিৎসা কী?

কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রচুর জল ও সহজপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এবং জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ও চুলকানি কমানোর জন্য ক্যালামিন লোশনই যথেষ্ট। অবশ্য কখনো সখনো এই অসুখের প্রকোপ খুব বেশি হলে, অ্যাসাইক্লোভির ও অন্যান্য অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। জ্বর কমানোর জন্য আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ একদম দেওয়া চলবে না, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

জ্বর কমানোর জন্য আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ একদম দেওয়া চলবে না, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

এই রোগের জটিলতা কী কী হতে পারে?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দেয় না। তবে অপুষ্টিতে ভুগলে বা বেশি বয়সে এই রোগ হলে, এমনকি কখনো কখনো অন্য সবদিক থেকে সুস্থ শিশুদের মধ্যেও নিউমোনিয়া, রক্তক্ষরণ, এনকেফালাইটিস বা অন্যান্য স্নায়ুর রোগ দেখা দিতে পারে। যথা সময়ে এসবের চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ চিকেন পক্স থেকে মৃত্যুর হার এক শতাংশেরও কম।

গর্ভবতী মহিলাদের চিকেন পক্স হলে শিশুদের জন্মগত অনেক ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এছাড়া

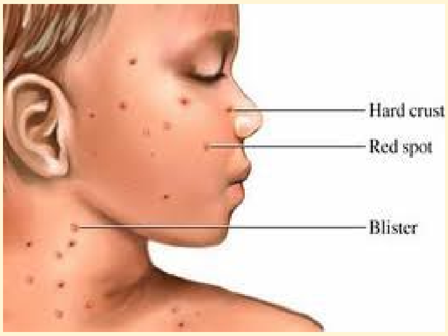

যাঁদের আগে চিকেন পক্স হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কম বেশি ২০ শতাংশের ভবিষ্যতে হারপিস জস্টার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভবতী মহিলাদের চিকেন পক্স হলে শিশুদের জন্মগত অনেক ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

এই রোগ প্রতিরোধের উপায় কি?

এই অসুখে একবার যিনি ভুগেছেন, তাঁর শরীরে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় যার জন্য তাঁদের মধ্যে আবার এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না বললেই চলে।

অবশ্য ইদানীংকালে চিকেন পক্সের প্রতিষেধক টিকা ব্যবহার করা হচ্ছে। যাঁদের এই রোগ একবার হয়েছে, তাঁদের এই টিকা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ADVT
Glenmark
Inspiring Innovation
Leading Integrated Research Based
Global Pharmaceutical Company
Out-licensing GBR 500, the monoclonal antibody in a landmark deal
First novel biologics out-licensing deal from an Indian company
Gracewell
Dermatology is within us
Offering you advanced therapeutic options in Dermatology

কাদের দেওয়া যেতে পারে চিকেন পক্সের টিকা?

১৩ বছরের কম বয়সী যে সব বাচ্চাদের আগে কখনো এই রোগ হয়নি, তাদের এই প্রতিষেধকের প্রথম টিকা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে ১২-১৫ মাস বয়সে প্রথমে টিকা, এবং তারপর আরো একটি টিকা দেওয়া হয় ৪-৬ বছর বয়সের মধ্যে।

১৩ বছর বয়সের উর্দ্ধে যাদের আগে কখনো এই রোগ হয়নি তাদের ৪-৮ সপ্তাহের তফাতে দুই বার এই টিকা দেওয়া হয়।

মনে রাখা দরকার, যাদের কোন কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে তাদের এবং গর্ভবতী মহিলাদের এই টিকা দেওয়া উচিত নয়।

এই টিকার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু কথা

চিকেন পক্স টিকার দুটি ডোজ পেলে পরে ৯০ শতাংশের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না এমনটাই মনে করেন অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানী। এই টিকাকরণের ফলে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে, এই রোগের প্রকোপজনিত জটিলতা এড়ানো যায়।

আবার কোনো কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের মতে এতটা উপযোগী নয় এই টিকা। তাঁদের মতে এই টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। এছাড়াও এই টিকা থেকেও ভবিষ্যতে হারপিস জস্টার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায় যা চিকেন পক্সের থেকে অনেক বেশি গুরুতর অসুখ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, এই টিকার দাম যথেষ্ট বেশি যা বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে বেশির ভাগ পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে। হাম, ডিপথেরিয়া বা পোলিওর মত চিকেন পক্স অতটা গুরুতর কোন রোগ নয়, তাই জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত হয়নি এখনো এই টিকা।

এই টিকার প্রতিরোধ ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। এছাড়াও এই টিকা থেকেও ভবিষ্যতে হারপিস জস্টার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়

লেখক পরিচিতি : ডা. শুভঙ্কর মুখার্জী, এম বি বি এস, ডি পি এইচ, এম ডি, কলকাতার একটি সরকারি মেডিকাল কলেজে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

কুইজ

প্রশ্ন :

১। মহিলাদের কোন ধরনের হার্নিয়া সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?

২। ধূমপানের কারণে যে কোনো ঘা শুকোতে দেরী হয় কেন?

৩। কে প্রথম মানুষের শরীরে রক্তপরিভরন (ব্লাড ট্রান্সফিউসন)-এ সফল হয়েছিলেন?

৪। পূঁজ ভরা স্ফোটকের (অ্যাবসেস) পূঁজ বার না করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে অনেক সময় তা বড় লাল টিউমারের মত দেখতে লাগে—একে কি বলে?

৫। যৌনক্ষম পুরুষের যৌনাঙ্গে সবচেয়ে বেশি কোন রোগের কারণে ক্ষত দেখা যায়?

৬। কোন রোগ প্রতিষেধক টিকা গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ?

৭। জনস্বাস্থ্য কল্যাণের উদ্দেশ্যে রক্তাল্পতা নির্ণয়ের সবচেয়ে ভাল পরীক্ষা কি?

৮। কোন বিরল জন্মগত ত্রুটিতে মহিলার ইউটেরাস ও ফ্যালোপিয়ান টিউব থাকে না?

৯। গর্ভাবস্থায় কোন রোগে জরায়ুর আলট্রাসোনোগ্রাফি ছবিকে 'বরফ ঝড়'-এর মত দেখায়?

১০। "খাদ্যই তোমার ওষুধ হোক আর ওষুধই হোক খাবার"—এই প্রাচীন বিখ্যাত উক্তিটি কার?

১১। কোন রোগের শেষ পরিণতি মেরুদণ্ডের সব অস্থিসন্ধিগুলো জোড়া লেগে যাওয়া?

১২। আই ইউ সি ডি-র পুরো কথা কী?

১৩। চোখের দূরের ও কাছের দৃষ্টির ত্রুটির ক্ষেত্রে যথাক্রমে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়?

১৪। চোখের পাতার মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের প্রদাহের ফলে পাতায় ছোট গুটি দেখা যায়—তাকে ডাক্তারি পরিভাষায় কি বলে?

১৫। এক ধরনের মানসিক সমস্যায় মানুষকে ইট, মাটি, দেয়ালের চুনসুরকি ইত্যাদি খেতে দেখা যায়—এই সমস্যাকে কি বলে?

এবারের ক্যুইজটি তৈরি করেছেন অভিষেক দাস, তিনি পুনেতে এম বি বি এস পাঠরত ছাত্র।

উত্তর ... ২০ পৃষ্ঠায়।

Acne, Hair Fall,Vitiligo – Do **NOT** Despair.
All are Treatable.
Consult your Dermatologist

ALKEM
Derma Care
Adding Value to Skin Care

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

ভোপাল—বিষে আক্রান্ত দ্বিতীয় প্রজন্ম

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গভীর রাত্রে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বিষবাষ্প আর বহুদিন ধরে বাতাসে-জলে মিশে-থাকা ভয়ঙ্কর রাসায়নিকগুলি এখনও সক্রিয়; আজকে ভোপালে মাতৃগর্ভে প্রাণের অঙ্কুর হয়ে উঠছে যে শিশু সেও এই বিষের ছোবলে জর্জরিত। ভোপালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মারক-রাসায়নিকে আক্রান্তদের চিহ্নিত করার ক্যাম্প থেকে তাদের কথা বলছেন **ডা. শর্মিলা মল্লিক।**

ক'দিন ধরে ই-মেলটা আমার কাছে আসছিল। গ্যাসপীড়িতদের মধ্যে জন্মগত বিকৃতি বা বিকলাঙ্গতা নির্ণয়ের জন্য একটা মারী-সমীক্ষা (epidemiological study)-তে অংশগ্রহণ করার জন্য। আহ্বায়কদের মধ্যে নাম ছিল স্বরূপ সরকার, স্মরজিৎ জানা ও রণবীর পালের। ই-মেলটা পাঠাচ্ছিল জ্যোতি (ডা. জ্যোতির্ময় সমাজদার)। প্রথমে পাত্তা দিইনি। কিন্তু বারবার মেল পাবার পর কিছুটা আগ্রহ তৈরি হল। প্রথম কারণ, জনবসতির মধ্যে গিয়ে মারী-সমীক্ষা বা জন্মগত বিকৃতি নির্ণয় করার মতো কাজে আমার বিষয়গত ভাবে কিছুটা পারদর্শিতা আছে। দ্বিতীয় কারণ, কাজটা ভোপালের গ্যাস-আক্রান্তদের মধ্যে— যাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম এই বিষগ্যাসের কতটা শিকার—তা জানার বা দেখার একটা উৎসাহ। তৃতীয়ত, কাজটা ভোপালে—পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এ ধরনের কোনও কাজ করার সুযোগ মেলা—চেনাজানা গণ্ডির বাইরের মানুষের সঙ্গে, তাদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করার একটা সুযোগ পাওয়া। এছাড়া নিজের একঘেয়ে প্রথাগত কাজের বাইরে গিয়ে ছ'দিনের জন্য একটু অন্যরকম, একটু আলাদা জীবন আস্বাদন করার লোভ সামলাতে না-পারা।

ভোপালের অভিজ্ঞতা : ছ'দিনের জন্য ভোপালে আমাদের ঠিকানা ছিল সম্ভাবনা ট্রাস্টের অতিথিশালা। একতলায় আউটডোর, দোতলায় অতিথিশালা, লাইব্রেরি, কনফারেন্স হল, ইত্যাদি। খুবই ঘরোয়া পরিবেশ। জ্যোতি তো photo-maniac, সারাদিন ছবি তুলে কাটাত। সকালে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় গরম জল না-পাওয়া, মশার প্রবল উপদ্রব, অতিথিশালার প্রয়োজনীয় সার্ভিস-এর খামতি ও ফেরার সময় কিছুটা অসুবিধা খানিকটা সমস্যা তৈরি করেছিল সেক্ষেত্রে ওখানকার স্বেচ্ছাসেবী ও ফিজিওথেরাপিস্ট দেবেনের উপস্থিতি ও সহযোগিতা আমাদের স্বস্তি দিয়েছিল।

৪ঠা নভেম্বর ২০১২ থেকে শুরু হল আমাদের ক্যাম্প। সম্ভাবনার গবেষণা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে জন্মগত বিকৃতির কেসগুলোর কমপ্যুটারাইজড্ ডাটাবেস তৈরি করেছে। আমাদের ডাক্তারদের কাজ হল সেই কেসগুলোকে কনফার্ম করা। কতরকম কেস যে দেখেছি এই ক'দিনে তা সারা জীবনে মেডিকেল কলেজে দেখিনি। জোড়-লাগা আঙ্গুল (syndactyly), অতিরিক্ত আঙ্গুল (polydactyly) ওপরের ঠোঁট-কাটা (cleft lip), জিভটা মুখের মধ্যে বেশি আটকানো (tongue-tie), পেটের মধ্যে থাকা অণ্ডকোষ, ক্লাব ফুট (club foot), কানের বিকৃতি, জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটি, মানসমন্দন (mental retardation) আরও কত কী! এত বেশি সংখ্যক মানসমন্দনের উপস্থিতি আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে সব কেস সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারিনি। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি আমাদের মধ্যে একজন শিশ রোগ ও অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা। জন্মগত বিকৃতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ বা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তাঁদের মতামতের জন্য রেফার করতে হয়েছে।

সমীক্ষার কথা : মারী-সমীক্ষায় তিনটি জনগোষ্ঠী নেওয়া হয়েছে।

১। গ্যাসপীড়িত (সরকারি সিলমোহরপ্রাপ্ত)

২। যারা জলদূষিত অঞ্চলে বাস করে, অর্থাৎ ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য যে অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করেছে।

৩। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে ১০ কিমি দূরে গ্যাসপীড়িত বা দূষিত জল নেই এমন একটা এলাকা বেছে নেওয়া হয়েছে। এটি কন্ট্রোল। তিনটি অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী থেকে গবেষণাকর্মীদের নির্ণয় করা জন্মগতভাবে বিকৃত রোগীর সংখ্যা ৩৫০০। এই বিকৃতি বা বিকলাঙ্গতা গ্যাসপীড়িত বা জলদূষিত অঞ্চলে কন্ট্রোল এলাকার তুলনায় বেশি কি না এবং বেশি হলে কতটা বেশি—এটা খুঁজে বের করাই ছিল এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলতে হয় গবেষক কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা। এই ৬দিন তাদের দেখেছি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। প্রতিদিন ক্যাম্পের পর সেদিনের কাজের পর্যালোচনা এবং পরের দিনের কাজের পরিকল্পনার জন্য এদের দেখেছি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে ট্রাস্টের নির্দিষ্ট ঘরে। আবার পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই দেখেছি ওরা হাজির। ক্যাম্পেও তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব তারা একনিষ্ঠ ভাবে পালন করেছে—কেউ করেছে ফর্ম ভরার কাজ, কেউ ছবি তুলেছে অঙ্গবিকৃতি এবং কেস-এর মুখমণ্ডলের যাতে পরবর্তীকালে আইডেন্টিফাই করা যায়, কেউ দায়িত্বে আছে উচ্চতা, ওজন, মাথার পরিধি, ইত্যাদি মাপার জন্য, কেউ ব্যস্ত কমপ্যুটারে ডাটা বন্দী করতে। এর মধ্যেই কেউ কেউ নথিভুক্ত যে সব রোগী তখনও ক্যাম্পে আসেনি তাঁদের বাড়িতে চলে যাচ্ছে তাঁদের শিবিরে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করতে। ভাষাগত অসুবিধের জন্য গবেষক কর্মীরা ডাক্তারদের সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছে। সম্ভাবনা ট্রাস্টের প্রধান স্তম্ভ সথ্যু (সতীনাথ সারঙ্গী) ও রচনার (রচনা ধিংড়া) নেতৃত্বে পুরো কাজটাই খুব সংগঠিত ভাবে করা হয়েছে। তবে ডা. রণবীর পাল ও ডা. স্বরূপ সরকারের অনুপস্থিতিতে কিছুটা দুঃখিত হয়েছি।

এরই মধ্যে সুযোগ হয়েছিল ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার ভিতর ঢোকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সি এস আই আর, লক্ষ্ণৌ, কারখানার ভিতর বিভিন্ন স্তর থেকে জলও মাটির নমুনা নিচ্ছে পরীক্ষার জন্য। ওখানেই আলাপ হল বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এত বেশি অঙ্গবিকৃতি, বিশেষত মানসমন্দনের কারণ খুঁজে পাওয়ার জন্য molecular epidemiological level study-র প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলেন একজন বিজ্ঞানী। কারখানায় MIC গ্যাস বেরিয়েছিল যে অংশ থেকে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কিন্তু তেড়ে এল সিকিউরিটির লোকজন। কারখানার গেটের সামনে পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে এক শিবমন্দির। প্রচার, নীলকণ্ঠ শিব কারখানাকে বিষমুক্ত করবেন।

পরিশেষে বলতে হয় সম্ভাবনা ট্রাস্টের বাড়িটি সম্পর্কে। চারদিকে বস্তিতে ঘেরা কয়েক বিঘা জমিতে ট্রাস্টের বাড়িটা মরূদ্যানের মতো। গঠনশৈলিতে পরিবেশ সচেতনতা ও সুরক্ষার ছাপ স্পষ্ট সৌর বিদ্যুৎ, রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, চারদিকে ভেষজ গাছের বাগান। কচ্ছপ ও মাছ খেলা করে ফোয়ারার জলে, কাঠবিড়ালি ঘুরে বেড়ায় অকুতোভয়ে, রাতের বেলা পেঁচা এসে বসে থাকে ছাদের কার্নিশে। এই অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিলা মল্লিক, এম বি বি এস, এম ডি, কম্যুনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারি মেডিকাল কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের পদে কর্মরত।

গবেষণা থেকে গণআন্দোলনে

চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথচলা

ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৪। গভীর রাত্রে মৃত্যু কার্বাইড কারখানা থেকে বেরনো বিষবাষ্প হয়ে আছড়ে পড়েছিল ভোপালের রাস্তায় বস্তিতে। গণকবরখানায় শ্মশানে অগণিত অচেনা শবের শেষকৃত্য, হাসপাতালে মৃত্যুকষ্ট-জর্জরিত শরীরে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা নরকদর্শন, তারপর সব-হারানোর দলে কোনমতে নামহীন বেঁচে থাকা—এই বুঝি মানুষের শেষ পরিণতি? দেশের সরকারের বিদেশী কোম্পানি ইউনিয়ন কার্বাইডকে আড়াল করার জন্য মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো আর অসুস্থদের তাড়িয়ে দেওয়া, সরকারী চিকিৎসকদের তদন্ত মাঝপথে হঠাৎ লাটে তুলে দেওয়া—কিছুটই কি করার নেই আমাদের, যারা নিজেদের গর্ব করে পরিচয় দিই ডাক্তার বলে? চিকিৎসক তাঁর নিজের পেশার দায়িত্বের জায়গা থেকে, নিজের বৈজ্ঞানিক সত্ত্বার খাতিরে গবেষণা থেকে, ক্রমশ পৌঁছে যান মানুষের রোগের ধারাবাহিক তথ্য-সংকলনে, আর তা-ই হয়ে ওঠে জন-আন্দোলনের হাতিয়ার—লিখছেন **ডা. জ্যোতির্ময় সমাজদার।**

সেবার গিয়েছিলাম সাধারণ স্লিপার কোচের একটা পাশের নীচের বার্থ দুই বন্ধু ভাগাভাগি করে, আর.এ.সি-তে। আমি আর সুরজিৎ (ডা. সুরজিৎ বিশ্বাস)। বম্বে মেল ভায়া নাগপুর ধরেছি—ভোপাল যাব। রেলরুটটাও জানা ছিল না। বম্বে মেল ভায়া এলাহাবাদ ইটারসি হয়ে যেতে হয়। মেডিকাল কলেজের সদ্য পাশ করা আমরা দুই জুনিয়ার ডাক্তার ভোপালের গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসার জন্যে অদম্য উৎসাহে চলেছি। সারা বাংলা জুনিয়ার ডাক্তার ফেডারেশন (All Bengal Junior Doctors' Federation বা এবিজেডিএফ) এবং ড্রাগ অ্যাকশান ফোরাম (পশ্চিমবঙ্গ)-এর প্রতিনিধি হয়ে ভোপালের বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেব। 'জহরীলি গ্যাস কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা অর্থাৎ ZGKSM)-র বন্ধুরা তখন ওখানে গ্যাসপীড়িতদের মধ্যে কাজ করছিল। পকেটে প্রফেসর ডা. সুজিত দাস-এর দেওয়া তিনশটি টাকা, হাতে স্বরূপ-দার (ডা. স্বরূপ সরকার) হাতে লেখা একটা ঠিকানা প্রফেসরস' কলোনী, চার বাংলা এরিয়া, ভোপালের ছোট লেকের পারে। সেটা ছিল ১৯৮৪ সালের মে মাস।

নভেম্বর ২০১২। এবার চলেছি প্লেন-এ। সঙ্গে ডা. শর্মিলা মল্লিক আর ডা. পার্থ ঘোষ। দুপুরে বেরিয়ে ভর সন্ধ্যেতে নামলাম ঝকঝকে রাজাভোজ এয়ারপোর্টে। ট্যাক্সি ধরে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার গা ঘেঁষে বারেশিয়া রোডে 'সম্ভাবনা ট্রাস্ট'-এর হসপিটাল।

বন্ধু সতীনাথ সারঙ্গী (সথ্যু)-র আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দোতালায় ওদের অতিথি ভবনে গিয়ে উঠলাম। সেদিনের ZGKSM আর 'সম্ভাবনা ট্রাস্ট' ক্লিনিকের মধ্যে ঐ একজনই যোগসূত্র—'সথ্যু'। ভোপাল আন্দোলনের ইতিহাস ওকে বাদ দিয়ে লেখা যাবে না। আমরা এসেছি গ্যাসপীড়িত বস্তিতে বিকলাঙ্গ শিশুদের রুগ্ন হওয়ার পেছনে কারণ খুঁজতে। সে কারণ জন্মগত (congenital) কিনা সেটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কয়েকহাজার বিকলাঙ্গ শিশুর হদিশ পেয়েছেন 'সম্ভাবনা ট্রাস্ট'-এর স্বাস্থ্যকর্মীরা। কলকাতা থেকে ছোট-ছোট দলে ডাক্তার বন্ধুরা আসবেন এইটা বুঝতে যে এই শিশুদের মধ্যে কতজন জন্মগত কারণে ভুগছে এবং তাদের মায়েদের শরীরে ভোপালের বিষ-গ্যাস এবং জলের প্রভাব পড়েছিল কিনা।

এই ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই আঠাশ বছর আগে কার্বাইড কারখানার দুনম্বর গেটের ভেতরের মাঠে 'জনস্বাস্থ্য হাসপাতাল' গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। সেখানে MIC গ্যাসের বিষক্রিয়া কাটানোর জন্যে 'সোডিয়াম থায়োসালফেট' ইনজেকশান দিয়ে detoxification করার ব্যবস্থা চলেছিল। সেই সফল এবং কার্যকরী চিকিৎসার রেকর্ড-ও রাখা হত যত্ন সহকারে। একদিন রাতে তদানীন্তন সরকার সেই ক্লিনিক তছনছ করে ডাক্তারি রেকর্ড লোপাট করে ডাক্তারদের ধরে নিয়ে যায় ভোপাল জেলে। সেই চিকিৎসা এবং গবেষণার কাজ সাময়িকভাবে থেমে গেলেও তা আজ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছে সতীনাথ ও তার বন্ধুরা।

'গ্রীনপীস' এবং ইউরোপের পরিবেশবাদী বন্ধু সংগঠকদের অর্থ সাহায্যে 'সম্ভাবনা ট্রাস্ট' কার্বাইডের কাছেই বাফনা কলোনীর ছ' বিঘা জঞ্জালপূর্ণ জমি সাফ করে তার উপরেই বিকল্প আর্কিটেকচারের সাহায্যে এক সুদৃশ্য পরিবেশবন্ধু হাসপাতাল গড়ে তুলেছে। ছড়ানো-ছিটোনো দোতালা বাড়ি—সঙ্গে ওষধি বাগান—সৌরশক্তি ধরার ব্যবস্থা, কেঁচো এবং জৈব সারের চাষ, বৃষ্টির 'জল ধরো—জল ভরো' ব্যবস্থা সবই আছে এখানে।

'সম্ভাবনা ট্রাস্ট'-এরই জনাকুড়ি স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী গত কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্বাইড-সংলগ্ন গ্যাসপীড়িত মানুষদের মেডিকাল রেকর্ডের এক কার্যকরী ব্যাঙ্ক তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। সব তথ্য কম্প্যুটারজাত করা হয়েছে। প্রয়োজনে তার থেকে নির্দিষ্ট মানুষের মেডিকাল ও সামাজিক রেকর্ড সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। 'সম্ভাবনা টিম' বস্তি ধরে ধরে ঘরে ঘরে গিয়ে বিকলাঙ্গ শিশু কিশোর-কিশোরীদের সনাক্ত করে রেখেছে। আমাদের ডাক্তারদের কাজ এদের রোগ জন্মগত কিনা সেটা দেখা, ও যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে রোগটি কি তা নির্ণয় করা।

আঠাশ বছর আগের সেই বড় সাধ ছিল — 'জনস্বাস্থ্য ক্লিনিক'-এর জায়গাটা আমরা গিয়ে একবার দেখব। কার্বাইড কারখানার ভেতর ঢোকা এখন সহজ নয়। প্রধান গেটটি পাঁচিল তুলে আটকে দেওয়া হয়েছে। সুযোগ এসে গেল কাকতালীয়ভাবে। সথ্যুদের করা জনস্বার্থ মামলার ফল হিসেবে সুপ্রীমকোর্ট আদেশ দিয়েছে কারখানার ভেতরের মাটির নীচের জলের নমুনা সংগ্রহ করার। সেই আদেশবলে সথ্যুদের উপস্থিতি সেখানে সহজ। তাদের পেছনে পেছনে আমরাও ঢুকে পড়লাম কার্বাইডের খন্ডহারে। চলে গেলাম কুখ্যাত MIC

> অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—মনে হচ্ছিল সাইরেন বাজছে—ধোঁওয়া ছেয়ে ফেলছে ভোপালের আকাশ—চারিদিকে দমবন্ধ করা অবস্থা—হাজার মানুষের গোঙানির শব্দ।

এবং কীটনাশক তৈরীর প্লান্টের কাছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম---মনে হচ্ছিল সাইরেন বাজছে---ধোঁওয়া ছেয়ে ফেলছে ভোপালের আকাশ—চারিদিকে দমবন্ধ করা অবস্থা—হাজার মানুষের গোঙানির শব্দ। ঘোরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম ফাঁকা মাঠটায়, যেখানে একসময় 'জনস্বাস্থ্য ক্লিনিক' চলত। আমাদের বসানো কালো ভিত্তিপ্রস্তরটা উপড়ে নিয়ে গিয়েছে

৩রা জুন ১৯৮৫
ভোপাল গ্যাস কান্ডের
ছয় মাস বাদে
ইউনিয়ন কার্বাইডের নৃশংস অপরাধ
এবং
সরকারের তরফে তাকে আড়াল করা
এবং গ্যাসপীড়িতদের লাগাতার অবহেলা করার
বিরুদ্ধে জন সংঘর্ষ দ্বারা
আজ এই স্থানকে
মুক্তাঞ্চল
ঘোষণা করে
জনগণের দাবী অনুযায়ী
লক্ষলক্ষ গ্যাসপীড়িতদের
বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক চিকিৎসার জন্য
হাসপাতালের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল।
(দ্বিতীয় প্রচ্ছদের ছবি দেখুন)

সরকার। আর আশ্চর্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট শিবমন্দির। মানুষের রক্তে MIC বিষ কাটানোর ক্লিনিকের জায়গায় উঠে আছে নীলকণ্ঠ শিব। ভোপালের বিষ নির্বিষ করার দায়িত্ব ডাক্তারদের হাত থেকে কেড়ে তাকেই দিয়েছে বিজেপি সরকার। সত্য সেলুকাস ...

এবার কার্বাইডের পেছনের ওড়িয়া বস্তি দিয়েই কাজ শুরু করলাম আমরা। পেছনের এই বস্তিগুলোতে বিষগ্যাস ছোবল মারেনি কোনদিনই। প্রথম দুদিনের কাজের পরেই শ-দুয়েক শিশুর জন্মগত অঙ্গহানি / অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পেলাম আমরা। টিমের ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এই

বস্তিগুলোতে বিষগ্যাস ছোবল মারেনি কোনদিনই। প্রথম দুদিনের কাজের পরেই শ-দুয়েক শিশুর জন্মগত অঙ্গহানি/ অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পেলাম আমরা।

বিষবাষ্পের উত্তরাধিকার

এই ২০১৩-য় যাঁদের বয়স কুড়ি বা ত্রিশের কোঠায়, তাদের অনেকেই ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। আমাদের অনেকেরই জন্মেরও আগে ঘটে যাওয়া সেই অভিশপ্ত রাত আমাদের কাছে আলাদা করে কোন গুরুত্বও পায় না। মাঝে মাঝে শুধু কোন কোন স্বেচ্ছাসেবী গণআন্দোলনকারী সংস্থার বক্তব্যের কিয়দংশ কানে আসে টিভির চ্যানেল বদলানোর ফাঁকে, কিংবা সেই দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা আদালতে ঝুলতে থাকা মামলার কোনও শুনানির খবর উঁকি মেরে যায় খবরের কাগজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাতায়। আর এই টুকরো খবরগুলোর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা কখনও মুখে ঝুলিয়ে রাখি স্রেফ উদাসীনতায়— তাতে আমাদের কী আসে যায়! কিংবা বিরক্তি — সেই তো কোনকালের কথা, যা হয়েছিলো সব তো চুকেবুকে গেছে, এমনকী সেই কারখানাও গেছে বিক্রি হয়ে, আর এই সব নিয়ে এত চর্বিতচর্বণ করে কী লাভ! কিন্তু যে সত্যি কথাটা আমরা জানি না, তা হলো সব কিছু চুকেবুকে যায়নি, সেদিনের সেই দুর্ঘটনার বিষাক্ত অভিশাপ বহন করে চলেছে বেঁচে যাওয়া আক্রান্ত মানুষেরাই শুধু নয়, তাদের হতভাগ্য পরবর্তী প্রজন্মও।

১৯৮৪-র ডিসেম্বরের সেই রাতে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার ট্যাঙ্ক থেকে লিক্ করেছিল বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস, সঙ্গে ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, মনোমিথাইল অ্যামাইন, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ইত্যাদির মতো আরো কিছু বিষাক্ত গ্যাসের মিশ্রণ। বিস্তৃত বর্ণনার জন্য http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal disaster দেখুন; আমরা ৮-ই মার্চ ২০১৩ সকাল ১১:১২ তে দেখে এখানে লিখছি।

মিথাইল আইসোসায়ানেট ব্যবহৃত হতো কীটনাশক কার্বারিল (Carbaryl), যার বাণিজ্যিক নাম সেভিন (Sevin) উৎপাদনের কাজে। মিথাইল আইসোসায়ানেট রাখা হতো তরল অবস্থায়; এই তরলের জ্বলনাঙ্ক ৩৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং জলের সঙ্গে এটি তীব্র তাপ উৎপাদনকারী রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। অর্থাৎ কোনও ট্যাঙ্কে রাখা এই তরল যদি জলের সংস্পর্শে আসে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ট্যাঙ্কের ভিতরের তাপমাত্রা বাড়ে, যা এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করে (বিজ্ঞানের পরিভাষায় Runaway reaction), যা ট্যাঙ্কের ভিতরের চাপ বাড়ায়, এবং শেষ পর্যন্ত ট্যাঙ্কের নিরাপত্তা-ভালভ (Safety-valve)-গুলি খুলে যায় চাপ হ্রাস করে ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ রোধ করার উদ্দেশ্যে। এমন কিছুই ঘটেছিলো সেই রাতে, ট্যাঙ্ক থেকে নির্গত সেই বিষবাষ্প দক্ষিণপূর্বে বয়ে যায় জনবসতির দিকে। এই বিষবাষ্পের ঘনত্ব বাতাসের চেয়ে বেশি, তাই তা জমা হয় মাটির কাছাকাছি, তাই ঘুমন্ত মানুষ ও শিশুরা আক্রান্ত হয় বেশি।

মানবশরীরে কিভাবে কাজ করে মিথাইল আইসোসায়ানেট?

মিথাইল আইসোসায়ানেট একটি অত্যন্ত শক্তিশালী শ্বাসনালীর প্রদাহ-সৃষ্টিকারী কটু গন্ধযুক্ত গ্যাস। মাত্রা খুব বেশি হলে খুব কম সময়েই এটি ভয়ানক জ্বলন, শ্বাসকষ্ট এমনকি মৃত্যুও ঘটাতে পারে[১,২]। মাত্র ০.৫ পি.পি.এম. (পি.পি.এম. হলো পদার্থের খুব কম ঘনত্বের মাত্রা মাপার একক) মাত্রাতেই এটি শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে। ২ পি.পি.এম. মাত্রায় শুরু হয় চোখে জ্বালা ধরা ও জল পড়া। অথচ ৩ পি.পি.এম. মাত্রা পর্যন্ত এর কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, তাই আক্রান্ত মানুষ সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায় না।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : এই গ্যাসের সংস্পর্শে আসার পরে অবিলম্বে আক্রান্ত হয় চোখ, শ্বাসতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ও ত্বক। চোখ থেকে জল পড়ে, অসুবিধা হয় আলোয় চোখ মেলতে, চোখের পাতা ফোলে, এমনকী কর্নিয়া (cornea)-তে ক্ষতও সৃষ্টি হতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়ার শুরু হয় বমি আর খিঁচুনি, এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তি কোমায় (coma) আচ্ছন্ন হতে পারেন। ত্বক লাল হয়ে যায়। ফুসকুড়ি (rash) দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে ভয়ানক ও জীবনহানিকর প্রভাব পড়ে শ্বাসতন্ত্রের উপর। প্রচণ্ড কাশির দমকে শ্বাস আটকে আসে। বুকে অদম্য ব্যথা আর শ্বাসকষ্ট হয়। কাশির সঙ্গে উঠে আসে রক্ত। নাকমুখ দিয়ে উঠে আসে গোলাপী গ্যাঁজলা (pink froth); শেষপর্যন্ত পালমোনারি ইডিমা (pulmonary edema) বা ফুসফুসে জল জমে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মেটাবোলিক অ্যাসিডোসিস (metabolic acidosis) হয়ে ওঠে মৃত্যুর কারণ।

দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া : দীর্ঘদিন পরেও এই বিষগ্যাসের কুপ্রভাব দেখা গেছে আক্রান্ত মানুষের চোখ ও শ্বাসতন্ত্র, এবং আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভস্থ শিশুদের উপর।

চোখের উপর ক্ষতিকর প্রভাবগুলিকে একত্রে নামকরণ করা হয়েছে "ভোপাল আই সিন্ড্রোম্" (Bhopal Eye Syndrome)[৩]; দেখা গেছে এই গ্যাসে আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে ট্র্যাকোমা (trachoma)-র হার বেড়েছে আশি শতাংশ, চোখের

পাতার সংক্রমণ বেড়েছে ছত্রিশ শতাংশ, চোখে জ্বালা হওয়া বেড়েছে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ। চোখে ছানি পড়া আর দৃষ্টিশক্তি কমার হার বেড়েছে।

আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের অস্বাভাবিকতা বজায় থেকেছে অন্ততঃ দু'বছরের জন্য[৪], এবং তাঁদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময়ের জন্য যাঁরা দুর্ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি ছিলেন[৫]। শ্বাসতন্ত্রে দেখা গেছে একটি বিশেষ রোগ, চিকিৎসা পরিভাষায় যার নাম ''রিঅ্যাকটিভ এয়ারওয়ে ডিস্ট্রেস্ সিন্ড্রোম্'' (Reactive Airway Distress Syndrome) বা RADS.[৬]; এক্ষেত্রে শ্বাসতন্ত্রের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মূল কারণ হলো ক্ষুদ্র শ্বাসনালীগুলি অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং শ্বাসনালীগুলির মধ্যবর্তী কলাগুলিতে তরল জমা হওয়া। দুর্ঘটনার এক থেকে সাত বছর পর পর্যন্ত আক্রান্ত মানুষদের শ্বাসতন্ত্রের পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাঁদের ফুসফুসে প্রদাহসৃষ্টিকারী কোষগুলি (মূলতঃ ম্যাক্রোফাজ ও লিম্ফোসাইট) জমার ফলে তাঁদের শ্বাসতন্ত্রের কর্মক্ষমতার অবনতি ঘটেছে, এবং এই অবনতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে তাঁদের যাঁরা সবচেয়ে বেশী পরিমাণ গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

গর্ভস্থ শিশুদের উপর প্রতিক্রিয়া : মিথাইল আইসোসায়ানেটের হাত থেকে রেহাই পায়নি গর্ভস্থ শিশুরাও। বেড়ে গেছে গর্ভপাতের হার, মৃত শিশু প্রসবের হার, এমনকী সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুহারও[৭]। এই দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ৮৬৫ জন গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তাঁদের মধ্যে তেতাল্লিশ শতাংশ মৃতশিশু প্রসব করেছেন, আর ভূমিষ্ঠ জীবন্ত শিশুদের চৌদ্দ শতাংশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে মাত্র এক বছর বয়সের মধ্যে [৮]। ওই কারখানার দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকারী সন্তানধারণক্ষম বয়সের ১০০ জন মহিলাকে নিয়ে সমীক্ষা করে দেখা যায় যে পরবর্তী সময়ে যে আটত্রিশ জন গর্ভবতী হন, তাঁদের মধ্যে উনত্রিশ জনের গর্ভপাত হয়, দুজন পূর্ণসময়ের আগে সন্তানের জন্ম দেন। সেই দুটি শিশুও ছিল একাধিক জন্মগত ত্রুটিসম্বলিত। মৃত গর্ভস্থ শিশুদের ময়নাতদন্তে ধরা পড়ে শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন ত্রুটিও[৯]।

সেই অভিশপ্ত রাতের প্রায় ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার জের টেনে নিয়ে চলেছেন কারখানা সংলগ্ন এলাকার বহু নারী-পুরুষ ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও। কিন্তু তার দায় আজও স্বীকার করেনি ভারত সরকার। শাস্তি হয়নি সেই মুনাফালোভী মালিকদের যারা মুনাফার লোভে বিষাক্ত গ্যাস সংরক্ষণ ও তা থেকে সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেনি— যার ফলে আজও বিপর্যস্ত বহু মানুষের জীবন। পরবর্তী বিষবাষ্পের মেঘ আজও তাদের জীবন থেকে মুছে যায়নি। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও চিকিৎসক (যাদের মধ্যে কলকাতার অনেক চিকিৎসকও আছেন) এখন চলমান ভোপাল-গ্যাসকান্ড পরবর্তী প্রজন্মে কী ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার বিবরণ নথিভুক্ত করছেন—ভোপাল আজও তার ক্ষত নিয়ে জেগে আছে।

এরপর কোনও একদিন ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার খবর খবরের কাগজের কোণে বা টিভির পর্দায় হঠাৎ চোখে পড়লে বোধহয় আর একটু বেশি সময় 'নষ্ট' হবে, তাই না?

তথ্যসূত্র : ১। ভি.ভি.পিল্লাই। কম্প্রিনেসিভ মেডিক্যাল টক্সিকোলজি। দ্বিতীয় সংস্করণ। ২০০৮। পরস মেডিক্যাল পাবলিশার। হায়দ্রাবাদ। ইণ্ডিয়া।

২। লুইস আর.জে.। স্যাক্সস ডেনজারাস প্রপার্টিজ্ অব্ ইনডাসট্রিয়াল মেটিরিয়ালস। দশম সংস্করণ। ২০০০। জন উইলি অ্যাণ্ড সানস্। নিউ ইয়র্ক। ইউ.এস.এ।

৩। অ্যাণ্ডারসন এন., আজবানি এম.কে., মাহাসন্দে এস.। ডিলেইড্ আই অ্যাণ্ড আদার কন্সিকোয়েন্সেস্ ফ্রম এক্সপোজার টু মিথাইল আইসোসায়ানেট ৯৩ % ফলোআপ অব্ এক্সপোজড্ অ্যাণ্ড আন্ এক্সপোজড্ কোহর্টস্ ইন ভোপাল। ব্রিটিশ জার্নাল অব্ ইনডাসট্রিয়াল মেডিসিন ১৯৯৯; ৪৭; ৫৫৩-৫৫৮

৪। কামতাত এস.আর., প্যাটেল এম.এইচ., প্রধান পি.ভি.। সিকোয়েন্সিয়াল রেস্পিরেটরি, সাইকোলজিক অ্যাণ্ড ইমিউনোলজিক স্টাডিজ্ ইন রিলেশন টু মিথাইল আইসোসায়ানেট এক্সপোজার ওভার টু ইয়ার্স উইথ মডেল ডেভেলপমেন্ট। এনভায়রন হেলথ্ পার্সপেক্ট ১৯৯২; ৯৭; ২৪১-২৫৩।

৫। কালিনান পি., অ্যাকুইলা এস.। রেস্পিরেটরি মরবিডিটি টেন ইয়ার্স আফটার দ্য ইউনিয়ন কার্বাইড গ্যাস লিক্ অ্যাট ভোপাল : আ ক্রস সেকশনাল সার্ভে। ভোপাল। ব্রিটিশ জার্নাল অব্ ইনডাসট্রিয়াল মেডিসিন ১৯৯৭; ৩১৪ : ৩৩৮-৩৪২।

৬। কামতাত এস.আর., প্যাটেল এম.এইচ., কোলহাতকার ভি.পি., এট অল.। সিকোয়েন্সিয়াল রেস্পিরেটরি চেঞ্জেস ইন দোজ্ এক্সপোজড্ টু টক্সিক গ্যাস অ্যাট ভোপাল। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিক্যাল রিসার্চ; ৮৬ (সাপ্লি) : ২০-৩৮।

৭। ভাণ্ডারী এন.আর., স্যাল এ. কে., কাম্বো, এট আল। প্রেগন্যান্সি আউটকাম ইন উইমেন এক্সপোজড্ টু টক্সিক গ্যাস অ্যাট ভোপাল। ইন্ডিয়ান জার্নাল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ ১৯৯০; ৯১:২৮-৩১।

৮। ভার্মা ডি.আর.। এপিডেমিওলজিকাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিজ্ অন দি এফেক্টস অব্ মিথাইল আইসোসায়ানেট অন্ দ্য কোর্স অব্ প্রেগন্যান্সি। এনভায়রন হেলথ্ পার্সপেক্ট ১৯৮৭; ৭২১৫১-১৫৫।

৯। মেহতা পি.এস., মেহতা এ.এস., মেহতা এস.জে., ভোপাল ট্র্যাজেডিজ্ হেলথ্ এফেক্টস। জার্নাল অব্ অ্যামেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৯০; ২৬৪:২৭৮১-২৭৮৭।

অদ্ভুত ঘটনা নজরে এসেছে বেশ কিছুকাল ধরেই। গ্যাসের প্রভাবে যদি না হয়, তাহলে এত বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের কারণ কি?

সথ্যু জানাল যে ১৯৭০ সালে কার্বাইড কারখানা কাজ শুরু করার সময়েই রাসায়নিক-ভরা বিষাক্ত জল দুটো পাইপের মাধ্যমে কার্বাইডের পেছনে কয়েক কিলোমিটার দূরে দুটো পুকুরে ফেলা হত। চাষীরা তখনি দেখেছিল— এখানকার গাছপালা হত হলুদ, ফসল হত বিকলাঙ্গ। চাষীরা প্রায়ই এর প্রতিবাদ কার্বাইড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু ফল হয়নি। গ্যাসকান্ডের পরে চারিদিকে যখন বিষক্রিয়ার প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে, সেই সময় কার্বাইড এক মস্ত ঝিল কেটে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ দুই পুকুরের বিষ মাটি এনে ভরে ফেলে। বিশেষ ধরনের পলিথিনের চাদর দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়। আশেপাশে থেকে মাটি দিয়ে জায়গাটা বুজিয়ে দেওয়া হয়। দূর থেকে এটাকে একটা প্রত্নতাত্বিক টিবির মত দেখায়। ক্লিনিকের কাজ সেরে আমরা জায়গাটা দেখতে গেলাম। আশেপাশে গরীব মানুষজন এই মাটি কেটেই বাড়ি বানাচ্ছেন। খোঁড়াখুড়ির ফলে সেই প্লাস্টিকের চাদর সরে গেছে। ছবি তুললাম তার।

বুঝতে পারলাম গত আঠাশ বছর ধরে বৃষ্টির জল এই মাটির বিষ ধুয়ে দূর-দূরান্তে বস্তির মধ্যে ছড়িয়েছে। মাটির তলায় সেই বিষ জমা হয়ে রয়েছে। এই বস্তিগুলোতে সরকার পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা আজও করেনি। টিউবওয়েল জল-ই প্রধান পানীয়। তাহলে কি এই বিষ-ই তিলে তিলে মায়েদের শরীরে জমেছে? তারই ফলে কি তাদের জন্ম দেওয়া শিশুরা বিকলাঙ্গ? ৩-রা ডিসেম্বর ১৯৮৪ রাতের বিষ-ছোবলের মতোই কি ভয়ঙ্কর সেই তিলে তিলে জমা বিষ-জল? ১৯৯০ সালের কার্বাইড কারখানা এবং তার আশেপাশের জল আর মাটিতে বিষের পরিমাণ মাপা হয়। সেই গোপন নথিতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে—মাটি এবং জলে যে পরিমাণ বিষ মিশে আছে তা একটি জলজ্যান্ত কাৎলা মাছকে নিমেষে মেরে ফেলতে সমর্থ।

ভোপালের এই গ্যাস-পীড়িত বস্তিগুলোতে বছর বছর চুনাও (ভোট) আসে। পরিশ্রুত নির্মল জলের সরবরাহের নিষ্ফলা দাবী ওঠে বার বার। ২৮ বছর পার হল, কেউ কথা রাখেনি।

১৯৮৫-র সেই সময় কারখানার বর্জ্য থেকে

সমুদ্রের জলে পারদ বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে মিনামাটা আন্দোলনের তরুণ উৎসাহী জাপানী যুবক উচি তানির সঙ্গে ভোপালে দেখা হয়েছিল। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে আমাদের বলেছিল ন্যায় বিচার পেতে ভোপালের আন্দোলন দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে না। আমরা তার কথা মানতে পারিনি। ভেবেছিলাম সবার চোখের সামনে হাজারো মানুষ খুন হয়েছে, কার্যকারণ যেখানে দিনের আলোর মত পরিষ্কার যেখানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিকদের ন্যায় পেতে বেশি দেরী লাগবে কেন?

২৮ বছর পরে, ভোপালের দ্বিতীয় প্রজন্মের শরীরে পঙ্গুত্বের কারণ এবং সংখ্যা নির্ধারণের এই বেসরকারী গবেষক দলের সদস্য হয়ে উচিতানির পরামর্শের যথার্থতা বুঝতে পারছি। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারের। শরীরে গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতির কারণ খোঁজা এবং চিকিৎসার দায়িত্ব দেশের সরকারের। অথচ অক্টোবর ১৯৯১-এ ভারত সরকারের নির্দেশ বলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) তার ভোপাল সংক্রান্ত সব গবেষণা বন্ধ করে দিল। কেন?

তখন, কোলকাতা থেকে দলে দলে ভোপালে যাওয়া জুনিয়ার ডাক্তারদের হৃদয়ে ছিল লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এক ঘাতক ব্যবস্থার শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালানোর তাগিদ। ক্ষতিগ্রস্ত, বিষগ্রস্ত মানুষের শরীর থেকে বিষ নির্মূল করার তরুণ ডাক্তারদের চ্যালেঞ্জ। কার্বাইডের বিষগ্যাসের পরিচয় গোপন করার সব অপচেষ্টা ছিন্ন করে জনস্বাস্থ্য ক্লিনিকে সোডিয়াম থায়োসালফেট (NATS) ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীর শরীর বিষমুক্ত করার যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। তাদের মেডিকেল রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে, ভবিষ্যতের আইনী লড়াই-এর রসদ যোগাড়ের টান টান উত্তেজনা। ক্ষোভ ছিল, ভোপালের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং সরকারী হাসপাতালের ডাক্তাররা কেন সর্বশক্তি এবং মেডিকেল জ্ঞান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না এ কাজে। কেন ভারতের অন্য রাজ্য থেকে ডাক্তারদের এসে এ কাজ করতে হচ্ছে? কেন ভোপাল সরকার আমাদের এ কাজ ভাল চোখে দেখছে না? কেন রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে জনস্বাস্থ্য ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়া হল? সেবারত ডাক্তাররা কেন জেলে? মেডিকেল রেকর্ডগুলো গেল কোথায়?

এখনও প্রশ্ন অনেক। জল যে বিষ কার্বাইড তো জানতো। জল শোধন করেনি কেন? সরকারকে জানায়নি কেন? সরকার কি নজর রাখত? ধিকি-ধিকি জলের বিষ আর হঠাৎ হাওয়ার দমকা বিষ কি একই ভাবে মানুষের শরীরে ক্রিয়া করে? ২৮ বছর বা তার বেশি বছর ধরে শরীরে দীর্ঘমেয়াদী বিষ কি রূপ ধরে বাসা বাঁধে? কী সেই পথ যা ধরে বাবা মায়ের শরীর থেকে বিষক্রিয়া ভ্রূণে ছোবল মারে? এই প্রজন্মেই কি এই বিষক্রিয়ার ইতি?

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯১ সালের অক্টোবরে ভারত সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির ভোপাল গ্যাস কাণ্ডের ক্ষতিপূরণ মামলার পরিণতি মেনে নেন এবং আদেশ দেন যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ঘাটতি ভারত সরকারকেই পূরণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতের যা ক্ষতিপূরণের দাবী উঠবে তাও ভারত সরকারকেই দিতে হবে। এই আদেশ বের বার ঠিক করেই আশ্চর্যজনকভাবে ICMR (Indian Council of Medical Research) ভোপালে তাদের সব গবেষণা বন্ধ করে দেন। সম্প্রতি গ্যাস পীড়িতদের তরফে এক জনস্বার্থ মামলার ফলে সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং ICMR কে আদেশ দিয়েছেন, ভোপাল গ্যাস পীড়িতদের নিয়ে মেডিকেল গবেষণা চালিয়ে যেতে।

ভোপালের বস্তিতে বস্তিতে অস্থায়ী গবেষণাগারে ক্লিনিকে যখন কাজ করি শ'য়ে শ'য়ে পঙ্গু শিশুর গ্যাস পীড়িত বাবা মায়ের করুণ, সাহায্যপ্রার্থী, জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রাখতে পারি না আমরা। স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্রের ডাক্তারেরা।

লেখক পরিচিতি : ডা. জ্যোতির্ময় সমাজদার, এম বি বি এস, ডি পি এম, এম ডি, মনোরোগবিদ ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

ভোপাল : মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের অধিকার

একজন তরুণ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে ভোপালে গ্যাস কাণ্ডের খবর শুনে খানিক রিলিফ দেবার কথা ভেবে তড়িঘড়ি করে সপ্তাহখানেকের মেয়াদে ভোপালে এলেন — এবং ২৮ বছর হতে চলল, ভোপালের মানুষের সাথে থাকা তাঁর এখনো চলছে। নিজের জীবনের সে কাহিনীর খানিকটা লিখেছেন **শ্রী সতীনাথ সারঙ্গী**।

ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার দিন ভোরে আমি যখন ভোপাল পৌঁছই তখন মানসিকভাবে আমি একদমই তৈরি ছিলাম না। ভোপাল থেকে চার ঘন্টা দূরে একটা শহরে আমি একটা NGO-তে কাজ করতাম। ভোপালে আমি কাউকেই চিনতাম না। পকেটে একশ টাকা নিয়ে, কয়েকটা কাপড়-জামা গুছিয়ে রওনা দিই। এক সপ্তাহের বেশি ভোপালে থাকতে হবে এমনটা ভাবি নি। সরকারি রেডিওতে যা খবর দিচ্ছিল আর যা আমি এসে দেখলাম তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

পরের দিন ভোরেই যে ট্রেনে ভোপাল পৌঁছলাম, তা প্রায় খালি। ট্রেনযাত্রীরা দেখলাম কেউ-ই জানে না যে ভোপালে কী ঘটেছে। অবশ্য দুর্ঘটনার ব্যাপকতা তিরিশ বছর পরেও আমরা খুঁজে চলেছি।

স্টেশন থেকে হেঁটে বেরিয়েই দেখি হাজার হাজার মানুষ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে—চোখগুলো ফোলা, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাঁধে ভর দিয়ে তারা চলেছে। কেউ কেউ টলতে টলতে হাঁটছিল, পড়েও গেল কেউ কেউ। আমার দেখার সময় ছিল না যে তারা অজ্ঞান হয়ে গেল, না মারা গেল।

ইউনিয়ন কার্বাইড থেকে স্টেশন দেড় কিলোমিটারের রাস্তা। কার্বাইড কারখানা ঘিরেই ঘনবসতিপূর্ণ গরীবদের বস্তি। এরা প্রায় সবাই গ্যাস-লিকে আক্রান্ত। আমার চারিদিকে জনসমুদ্র নয়, যেন ব্যথার সমুদ্র। এদের জন্যে কী করব তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। হাত-পা শিথিল হয়ে আসছিল। স্টেশনের গেটে দাঁড়িয়ে এই দিশাহীন মিছিলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর মাথাটা কাজ করতে শুরু করল। দেখলাম—নানান বয়সের লোকেরা তাঁদের মতো করে এঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় দলকেও দেখলাম কাজে লেগে পড়েছেন। স্টেশনের গেটের বাইরে বাস-স্ট্যান্ডটাই একটা রিলিফ ক্যাম্পের চেহারা নিয়েছে। অসুস্থ লোকেদের সেখানেই জড়ো করা হচ্ছে। দুধ, ফল, জল এসবের সামান্য ব্যবস্থা আছে। সান্ত্বনা আর সাহস-ই সেখানে একমাত্র হাতিয়ার। চোখের জ্বালা কমাতে চোখের ড্রপ-এর ব্যবস্থা চোখে পড়ল। শ্বাসকষ্ট আর পেটের জ্বালা কমানোর জন্য ওষুধ দেওয়া হচ্ছে দেখলাম। জোয়ান ছেলেদের একটাই কাজ—রাস্তায় গাড়ি অটকে তাতে আর্তদের তুলে হামিদিয়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে হাত লাগালাম।

স্টেশনের কাছের বস্তির মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। পা চালিয়ে সেদিকেই এগোলাম। কাজ হল যেকোন দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া, দরজা খুললেই চোখে পড়ছে পুরো পরিবার মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। অনেকেই অজ্ঞান হয়ে আছে। কেউ কেউ গোঙাচ্ছে, দু-একজনই কথা বলার অবস্থায় আছে। ছুটে ফিরে গেলাম রেলস্টেশনের গেটে। সেখান থেকে জনা পঞ্চাশেক ছেলেকে জোগাড় করে বস্তিতে ফিরে এলাম। তারপরেই সেই অনন্ত শোভাযাত্রা। ঘর থেকে তুলে, গাড়ি থামিয়ে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালের দিকে রওনা করে দেওয়া। আশ্চর্য, অটোরিক্সা-ট্রাক ড্রাইভার, প্রাইভেট গাড়ির চালক—কেউই একাজে একবারের জন্যে-ও না করেনি।

দরজা খুললেই চোখে পড়ছে পুরো পরিবার মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে

সাহায্যের রাস্তা খুঁজে নেওয়া : আমার ভোপালের প্রথম সন্ধ্যার আকাশ লালে লাল। শবদাহের আগুনে আকাশ গনগন করছে। আগের দিন রাত থেকেই আগুন একবারের জন্যও নেভেনি। কবরস্থানে একজনের সঙ্গে দেখা হল তাঁর সারা হাতে ফোস্কা। আর কি করতে হবে বুঝতে না পেরে, ভদ্রলোক তিনরাত তিনদিন ধরে কবর খুঁড়েই চলেছেন। একাজ তিনি আগে কোনদিনই করেন নি। আমারও অবশ্য একই অবস্থা দিশেহারা। এই অব্যবস্থা অনিশ্চয়তা কয়েকদিন চলার পরে কিছু প্রশ্ন মাথা চাড়া দিল। খাবার জলটা কি বিষমুক্ত? খাবার-দাবারে গ্যাসের বিষ মেশেনি তো? প্রথমদিনই দেখেছিলাম অনেক গর্ভবতী মায়েদেরই রাস্তাতেই মারা যেতে। কেউ কেউ মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু যে সন্তানেরা গর্ভে আছে তাদের কি অবস্থা?

ভদ্রলোক তিনরাত তিনদিন ধরে কবর খুঁড়েই চলেছেন। একাজ তিনি আগে কোনদিনই করেন নি।

কাজ করতে করতেই স্থানীয় ছাত্র, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী এবং আমার মত দলছুট ভোপালে আগত লোকেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে উঠল। অচিরেই মানুষের চিকিৎসার দাবী এবং পুনর্বাসনের জন্যে একটা সংগঠনের জন্ম হল। একজন বৈজ্ঞানিক, একজন আইনজীবি এবং বামপন্থী দলের এক নেতা এই জোটের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিলেন। আর্ত মানুষ এর চারিদিকেই জোট বাঁধতে শুরু করল। এই নতুন মোর্চা-ই দানসামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসাব্যবস্থা এবং আপদ্‌কালীন চিকিৎসা গ্যাসপীড়িতদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করল। এরই মধ্যে গ্যাসে মৃত্যুর কারণের সামান্য গবেষণার কাজও চলেছিল।

চিকিৎসার সাহায্য না-মঞ্জুর : শোনা গেল এক জার্মান টক্সিকোলজিস্ট (toxicologist) ভোপালে পৌঁছেছেন। তিনি পঞ্চাশ হাজার অ্যাম্পুল সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন সঙ্গে এনেছেন। শিরায় এই ইঞ্জেকশন দিলে গ্যাসের বিষক্রিয়া অনেকটা কেটে যাবে। গ্যাসপীড়িত মানুষ কিছুদুর সুস্থবোধ করবেন।

ক্ষমতায় থাকা সরকারী অফিসারেরা দ্রুত ইঞ্জেকশন নিয়ে গেলেন। কিন্তু জনগণের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার সময়তেই ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে এই ইঞ্জেকশনে সাধারণ মানুষের তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। অতএব মানুষ এই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হলেন।

বন্ধু বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে আমাদের গবেষণায় আমরা নিশ্চিতভাবে দেখেছি যে সোডিয়াম

ইউনিয়ন কার্বাইড গ্যাসের বিষক্রিয়া কাটানোর এই ইঞ্জেকশনের কার্যকারিতা প্রমাণ হোক এটা চায় নি।

থায়োসালফেট রক্তের থেকে বিষের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। হাজার মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করে। গর্ভস্থ শিশুকেও বিষমুক্ত পারে। ক্ষমতায় থাকা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কূটতর্কে এই জরুরী সাহায্য মানুষের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছয় নি।

মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ইউনিয়ন কার্বাইড গ্যাসের বিষক্রিয়া কাটানোর এই ইঞ্জেকশনের কার্যকারিতা প্রমাণ হোক এটা চায় নি। কারণ তাতে প্রমাণ হত গ্যাসপীড়িত মানুষের শুধু চোখ ও ফুসফুসের-ই ক্ষতি হয়নি, বরং এই গ্যাস রক্তের মাধ্যমে শরীরের সব অঙ্গেরই তীব্র ক্ষতি করেছে। কলকাতা, দিল্লী এবং ভোপালের জুনিয়ার ডাক্তারদের সাহায্যে যে জনস্বাস্থ্য ক্লিনিকে সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া হত সরকার পুলিশ দিয়ে সেই ক্লিনিক বন্ধ করে দেন এবং ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যান। ভোপালের সেই শুরুর দিনগুলোতেই বোঝা গিয়েছিল যে এ এক রাজনৈতিক লড়াই, শুধুমাত্র ত্রাণশিবির নয়।

সব শবের হিসেব নেই : মৃতদের হিসেব রাখতে নেই। তাহলেই এই গ্যাসকাণ্ডের ভয়াবহতা বিশ্বের দরবারে প্রমাণ হয়ে যাবে। তড়িঘড়ি শবের পাহাড় মাটির তলায় চাপা দিয়ে দেওয়া হল। কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, রক্ষণা-বেক্ষণের শোচনীয় অভাব, কারখানার গঠনগত ত্রুটি ঢিলেঢালা নজরদারি---এসব ইউনিয়ন কার্বাইড কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলাই

মৃতদের হিসেব রাখতে নেই। তাহলেই এই গ্যাসকাণ্ডের ভয়াবহতা বিশ্বের দরবারে প্রমাণ হয়ে যাবে।

প্রমাণ করে। ঘটনার চারদিন পরে ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসন ভোপালে আসেন। তিনি গ্রেপ্তার হবার পরই সরকারি বদান্যতায় এবং আশ্চর্যরকম দ্রুততায় তাঁকে জামিন পাইয়ে দিয়ে ভোপালের বাইরে রাজকীয় নিরাপত্তায় দেশে পালিয়ে যেতে সরকারই সাহায্য করে। এতেই প্রমাণ হয় যে সরকার এবং ইউনিয়ন কার্বাইড 'মাসতুতো ভাই'।

গ্যাস কাণ্ডের কয়েকদিনের পরে সরকার 'অপারেশন ফেইথ' (Operation Faith)-এর মাধ্যমে পড়ে থাকা বাকী দুটো ট্যাঙ্কে মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাসকে কীটনাশক তৈরীতে কাজে লাগিয়ে ফেলে। MIC গ্যাসের প্রমাণ লোপাট হয়। আমরা এ কাজকে বন্ধ করতে পারি নি।

বৈজ্ঞানিক সূত্র থেকে আমরা নিশ্চিত জানি যে কষ্টিক সোডা দিয়েই সেভিন (Sevin) কীটনাশক তৈরীতে ব্যবহৃত MIC গ্যাসকে নির্বিষ করা যায়। কিন্তু সরকার আমাদের কথা মানলেন না। 'Operation Faith' শুরু হবার আগেই, আমরা অসহায়ভাবে দেখলাম হাজার হাজার গ্যাসপীড়িত মানুষ দ্বিতীয়বারের জন্যে তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছেন। এলাকার কিছু মানুষ এবং আমরা রয়ে গেলাম বস্তির বাড়িগুলো পাহারা দিতে। চুরিচামারি ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি পুলিশরাও পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে জিনিসপত্র হাতিয়ে নিচ্ছিল। শীতের রাতে কাঠের আগুন পোয়াতে পোয়াতে আমরা গত কয়েকদিনের ঘটনারই স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। সঙ্গে ছিল কিছু ভেজা চটের ব্যাগ—গ্যাস লিক হলে সামলানোর জন্য। নিধিরাম সর্দার!

বিশ্বাস হত্যা

'বিশ্বাস ফেরানো' তথা 'Operation Faith' সাড়ম্বরে শুরু হল। কারখানাতে আবার কীটনাশক তৈরী করা শুরু করলেন সরকার। সরকারী হেলিকপ্টারে করে আকাশ থেকে জল ছেটানো শুরু হল। কার্বাইডের দেয়াল ঢেকে দেওয়া হল চট দিয়ে। জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল ঢেলে ঢেলে ভেজানো হতে থাকল। জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল রাস্তা। কদিন আগেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরা সাধারণ গরীব গুর্বোরা বললেন - 'বিড়ির ধোঁয়াই চট দিয়ে আটকানো যায় না, MIC গ্যাস তার পরোয়া করবে?'

হোমের কাঠ, ঘি আর ধূপ। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব থেকে ভোপালের হাওয়াকে শুদ্ধ করতে

বৃহৎ প্রেক্ষিত : আরও এক নাটকীয় ঘটনা এর পাশাপাশি ঘটছিল। ফ্যাক্টরীর দিকের রাস্তাতে শ'য়ে শ'য়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর সভ্যরা নেমে পড়লেন। সঙ্গে তাঁদের হোমের কাঠ, ঘি আর ধূপ। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব থেকে ভোপালের হাওয়াকে শুদ্ধ করতে এ ছিল তাঁদের কাছে মোক্ষম দাওয়াই। তাঁদের কারখানার কাছে যাওয়া থেকে কোনোরকমে আটকানো গেল। 'অপারেশন ফেইথ' (Operation Faith)-এর আগে সরকার প্রচার চালাচ্ছিলেন মানুষকে নির্ভয়ে থাকার জন্যে। সরকারই আবার শহর থেকে পালানোর জন্যে বিশেষ বাস-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সরকার এই নিরীহ, শান্তিপ্রিয় বস্তিবাসীদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদই দেখেন নি—ছোট ছোট রিলিফ ক্যাম্প-এর পত্তনেই তাঁদের ভয় হতে লাগল। এঁদের সবাইকে তাঁরা শহরের বাইরে নিয়ে রাখলেন। ফল উল্টো হল। নানান বস্তির লোকেরা একত্রিত হবার সুযোগ পেলেন আর মত-বিনিময় শুরু হল। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বাইরে ইউনিয়ন কার্বাইডের লুণ্ঠন, লাগামছাড়া মুনাফা, জনস্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা, সরকার ও কার্বাইডের মধ্যে অশুভ আঁতাত, ইত্যাদি বিষয় সামনে আসতে শুরু করল। ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ জোট বেঁধে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি করে আইনী লড়াই লড়া যায় তার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

আইনজীবি নয় তো ভাগাড়ের শকুন : ভোপাল শহর আমেরিকার আইনজীবিতে ছেয়ে গেল। স্থানীয় দালালদের দিয়ে গ্যাসপীড়িতদের ধরে ধরে ক্ষতিপূরণের ফর্ম সই করানো শুরু হল। স্ফীত ও জবাফুলের মত রাঙা চোখে তাঁরা দেখতেই পেলেন না যে সূক্ষ্ম অক্ষরে লেখা আছে যে ক্ষতিপূরণের চল্লিশ শতাংশ টাকা আইনজীবিদের

ন্যায্য প্রাপ্য। এই 'শকুন'দের মধ্যে প্রতিযোগিতা যখন তুঙ্গে, নতুন মক্কেল ধরার জন্যে তাঁরা কম্বল ও টাকা পয়সাও ছড়াতে শুরু করলেন। ভোপালের আকাশে বাতাসে লাখ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের মিথ্যে স্বপ্ন ভেসে বেড়াতে লাগল।

মানুষ নিজের শক্তি উপলব্ধি করল

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে মানুষ বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশের সরকারের মধ্যেকার যে রাজনীতি তাকে চিনতে শিখল। সরকার, রাজনীতিবিদ এবং কারখানার উচ্চ পদাধিকারীরা শ্রমিকদের জীবন ও যে অধিকারকে পাত্তাই দিত না, সেই বিষয়গুলোই রাজনীতির আঙিনায় মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল। অপারেশন ফেইথ-এর অব্যবহিত পরেই সরকার চাইছিলেন রিলিফ ক্যাম্পগুলো খালি করে মানুষ যে যার ঘরে ফিরে যাক। ক্যাম্প বন্ধ করার তোড়জোর শুরু হতেই হাজার হাজার পীড়িত মানুষ মিছিল করে রাজ্যপাল কে. এম. চান্ডির কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়ে ধর্ণা দিলেন।

ইউনিয়ন কার্বাইড গণমাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন যে এই গ্যাস লিক টিয়ার গ্যাস বা কাঁদানে গ্যাসের মতো সামান্য ঘটনা

কার্বাইডের মিথ্যা ভাষণ ও তঞ্চকতা :

ইতিমধ্যে ইউনিয়ন কার্বাইড গণমাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন যে এই গ্যাস লিক টিয়ার গ্যাস বা কাঁদানে গ্যাসের মতো সামান্য ঘটনা যার ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী নয়। বিদেশী চিকিৎসাবিদদের ভোপালে উড়িয়ে এনে স্থানীয় চিকিৎসকদের প্রভাবিত করা হল এবং কার্বাইডের মতকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলতে থাকল। দুর্ঘটনার ভয়াবহ ব্যাপকতার মোকাবিলা করার সাথে সাথে আরও এক বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো কার্বাইডের এইসব ছলচাতুরির বিরোধিতা করে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

চারিদিকে এত ঘটনার ঘনঘটায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার সময়ই পাইনি। সত্যিই কি ভোপালে থেকে যাব? কিভাবে টিকে থাকব এখানে? কতদিন ভোপালে থাকব? স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বন্ধুদের সাহায্যে আমার মতো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর শোবার জায়গা এবং দুবেলার খাবারের সংস্থান হচ্ছিল। সারাদিন বস্তিবাসীদের মধ্যেই কাজ করেই কেটে যেত। এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও দলবেঁধে গান বাজনা হাসি মস্করার মধ্যে সন্ধ্যেটা বেশ জমে উঠত।

মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি :

আমার ভোপালবাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহের বাড়ির দিকে পদযাত্রার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দিন ধার্য হল তেসরা জানুয়ারী, ১৯৮৫, গ্যাস-কাণ্ডের ঠিক এক মাসের মাথায়। ঠিক হল ঐদিন আমরা 'ধিক্কার-দিবস' পালন করব। দুর্গতদের প্রতি সরকারের সীমাহীন অবহেলা এবং দুর্গত মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দাবী তুলে ধরব। বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু হল। শারীরিক কষ্টের কারণে নড়া-চড়া করতে অক্ষম মানুষ ছাড়া সবাই এই মিছিলে যোগ দিলেন। কার্বাইডের সামনে থেকে একশ মানুষ হাঁটা শুরু করেছিলাম। চার কিলোমিটার যেতে না যেতেই মিছিল ফুলে-ফেঁপে ১০ হাজার মানুষের জোয়ার হয়ে উঠল। স্বতস্ফূর্তভাবে মানুষ তাঁদের ক্ষোভ আর আশা নিয়ে এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। টিলার উপরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাসাদপ্রতিম বাড়ির সামনে ১৫ হাজার মানুষ পৌঁছোলাম।

প্রতিবাদের জাদু :

মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে রাজী না হওয়ায় আমরা তার বাড়ির সামনে ধর্ণায় বসলাম। হাজার মানুষের প্রতিজ্ঞা যে তাঁরা তাঁদের দাবী না মানা পর্যন্ত এই জায়গা ছেড়ে নড়বেন না। টিলার গায়ে ছোট ছোট দলে সবাই ভাগ হয়ে বসে পড়লেন। সেই সপ্তাহের ঘটনা আমার মনে এখনও জ্বল-জ্বল করছে। গ্যাসপীড়িত মায়েরা বস্তি থেকে খাবার আনার ব্যবস্থা করলেন। সবার মধ্যে ভাগ করে নিলেন সেই খাবার। গ্যাসকাণ্ডে অনাথ কিশোররা তাদের নতুন খেলার সাথী খুঁজে পেল এই মিছিলে। নতুন শেখা শ্লোগানগুলো তারাও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল

'ডলার কি চাল নে,
জহর খোলা ভোপাল মে।'
'কার্বাইড-কে খুনী পাঞ্জা
তোড় দো, মার দো।'

কয়েকজন ডাক্তার স্বেচ্ছাসেবী বহু অসুস্থদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছিল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বন্ধুরা পাশের লাইটপোস্ট থেকে মাইকের কানেক্শন্ দিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন। সেই মাইকে শ্বাসের কষ্টে দম আটকে যাওয়া কবি 'মর্যাদা' ও 'মানুষের ক্ষমতা' নিয়ে কবিতা পাঠ করলেন। গৃহবধূরা যাঁরা কোনদিন গলা তুলে কথা বলেন নি, ঐ মাইকে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিতে লাগলেন।

আমি অবাক বিস্ময়ে মানুষের এই জেগে ওঠা, দল বাঁধা আর নতুন করে বেঁচে ওঠার ইচ্ছের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

ধর্ণার তিনদিনের মাথায় সরকার বাধ্য হলেন মাথা নোওয়াতে। অর্জুন সিং এই মিছিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেন। কিন্তু জনতা বলল, তা হবে না। তখন অর্জুন সিং তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানুষের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। মানুষের চাপে সরকারকে কথা বলতেই হয়, আমরা শিখলাম।

আফশোষ নেই :

ভোপাল মানুষের সাথে গত তিন দশকের আত্মীয়তার এইভাবেই সূচনা। ১৯৮৬ সালের প্রথমের দিকে 'জহরিলি গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা' (ZGKSM) ছেড়ে আমি 'Bhopal Group for Information & Action'' (BGIA) শুরু করি।

মানুষের চাপে সরকারকে কথা বলতেই হয়, আমরা শিখলাম

'সম্ভাবনা ট্রাস্ট' তৈরী করার বহুযুগ আগে স্বাস্থ্যকে নিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা তোলার (সোডিয়াম থায়োসালফেট কেলেঙ্কারি যার উদাহরণ) বিরুদ্ধে BGIA কাজ শুরু করে। 'Bhopal Medical Appeal'-এর মাধ্যমে দেশ বিদেশের সহমর্মীদের কাছ থেকে অনুদান জোগাড় করা গেল। এইভাবেই শুরু হল গ্যাসপীড়িতদের প্রথম নিজস্ব ক্লিনিক 'সম্ভাবনা ট্রাস্ট'-এর পথ চলা। সেটা ১৯৯৫।

আজ ঠিক মনে নেই কোন মাহেন্দ্রক্ষণে আমি ভোপালের মানুষের ব্যথা, বেদনা আর আনন্দের শরিক হয়ে গিয়েছি —বোধহয় সেটা ১৯৮৫-র গোড়ার ধর্ণা চলাকালীনই ঘটেছিল। শুধু এটুকু জানি, ২৮ বছর পেরিয়ে গেছে, একদিনও আমার এপথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কোনরকম আফশোস হয়নি।

লেখক পরিচিতি : সতীনাথ সারঙ্গী, সথ্যু নামে সমধিক পরিচিত। বর্তমানে ভোপালের সম্ভাবনা ট্রাস্ট-এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি। সম্ভাবনা ট্রাস্ট ভোপাল গ্যাসপীড়িতদের নিয়ে একটি ক্লিনিক চালায়, এছাড়াও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধটি The Bhopal Marathon নামক সংকলন গ্রন্থ থেকে সথ্যুর অনুমতিক্রমে বাংলায় পুর্নলিখিত হয়েছে।

বয়ঃসন্ধি : সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে দু'চার কথা

রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত ছোটোগল্পের বই লাইনগুলো মনে আছে? ''তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নেই। শোভাও নেই কোনও কাজেও লাগে না... তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া ওঠে... তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায় ... শৈশব ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনও স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অস্য বোধ হয়। সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না''— বয়ঃসন্ধির এই অপূর্ব বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষের জীবনের শৈশব ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণ যেমন আমাদের মনে কিশোর-কিশোরী সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তেমনি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও পরিবারে বা বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক ভুমিকা সম্বন্ধে দ্বিধার সৃষ্টি করে। তার পরিণাম হিসাবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। ঘন ঘন অতিরিক্ত রাগ হওয়া ও সেই রাগের দৃষ্টিকটু বহিঃপ্রকাশ ঘটানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি এবং অভিভাবকরা কি করলে তাদের প্রিয় সন্তানটির হঠাৎ বদলে যাওয়া দৃষ্টিকটু আচরণগুলিকে আয়ত্তে আনতে পারবেন সে সম্বন্ধে জানাচ্ছেন মনোবিদ **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১০ বছর থেকে ১৯ বছর বয়সকে বয়ঃসন্ধি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই বয়সে শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংঘর্ষ চলতে থাকে— সে যেন দুদিক থেকে পরিবারের কাছে চিন্তার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মা বাবা কখনও কখনও মনে করেন—আমার ছেলে বা মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, তাই আশা করা যায় সে পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো আচরণ করবে। আবার যদি ছেলেটি বা মেয়েটি কোন ক্ষেত্রে বড়দের মতো আচরণ করে তখন তাকে তার বাবা মা বলেন এই আচরণ তার করা উচিত হয়নি কারণ সে এখনও ছোট আছে। এই পরস্পর-বিরোধী আচরণ কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অসহায়তার সৃষ্টি করে। সে বুঝে উঠতে পারে না সে ছোট না বড়। আর সেই অসহায়তার থেকে সৃষ্টি হয় রাগ। অভিভাবকরা বড় হয়ে গেছে মনে করে তাদের এমন কিছু কিছু স্বাধীনতা দেন যে স্বাধীনতাকে তারা বেপরোয়া ভাবে ব্যবহার করতে থাকে। তখন মা বাবার মনে হঠাৎ করে সচেতনতা জন্মায় যে তাঁরা তাঁদের কিশোরবয়সী ছেলেমেয়েকে যতটা পরিণতমনস্ক মনে করেছিলেন তারা বোধহয় ততটা পরিণত হয়ে ওঠেনি। ফল হিসাবে শুরু হয় বিধিনিষেধের কড়াকড়ি। আর ছেলেটি বা মেয়েটির তখন মনে জমা হয় বিদ্রোহের আগুন। সমাজ ব্যবস্থা ও অভিভাবকের নির্দেশ মতো চলার মধ্যে সে তৃপ্তি পায় না, তার দরকার পড়ে 'হিরো' সাজার। তাই লুকিয়ে সে বিভিন্ন কাজ করতে থাকে, যা তাকে তার বন্ধুমহলে বিশেষ পরিচিতি দেয়, কিন্তু যেগুলো আবার বড়দের কাছে প্রায় অসামাজিক

কাজ বলে মনে হয়। ফলে সংঘর্ষ বাঁধে, আর সে সময়ে অভিভাবকদের তারা মনে করে যেন সব থেকে বড় শত্রু।

সংঘর্ষ কি অনিবার্য?

এ সমস্যার মোকাবিলা কি ভাবে করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে দু'চার কথায় আসি। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মন বুঝতে গেলে কিশোর বয়সের বৈশিষ্ট্যিগুলো অভিভাবকদের জানা দরকার। এই বয়সে হরমোনের প্রভাবে ও দ্রুত অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ধকলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ করার প্রবণতা বাড়ে। তারা খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে ও সামান্য কোন বিষয়ে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ার ঝোঁক বাড়ে। কিন্তু আমরা যারা বড় তারা ওদের এই ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে পড়ার আগে বিচার করে দেখতে হবে এটা সে বয়সের ধর্মে করছে। ভালবাসা ও সংবেদনশীলতাই এর প্রতিকার, পাল্টা উত্তেজনা কখনই নয়, অভিভাবকরা যদি সে সময়ে তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন ও সরাসরি প্রতিবাদ না করে তাদের যুক্তির ব্যবহার শেখান তা হলে অনেক ভাল ফল পেতে পরেন।

অনেক ক্ষেত্রেই এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত পরিপূর্ণতা দাবী করা হয়। পরীক্ষায় কোনও কারণে ফল খারাপ হলে তাকে দোষারোপ করা হয় যে সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে প্রাকৃতিক কারণেই তারা মানসিক ভাবে চঞ্চল হয়ে থাকে। তাই শুধু দোষারোপ না করে তাদের সমস্যাকে বুঝতে হবে। এই বয়সের এক বিশেষত্ব হল ভাল কথায় ও ভালবাসায় এদের মনের অনেক কাছে পৌঁছনো যায়। তখন তারা অভিভাবকদের শত্রু মনে না করে কাছের মানুষ মনে করে। তাদের সমস্যাগুলো তখন তারা মন খুলে মা বাবার কাছে বলতে পারে। সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের উচিত তার সব কাজকর্মকে খারাপ আখ্যা না দিয়ে যেগুলো সত্যিই ভবিষ্যতে তার ক্ষতি করতে পারে সেগুলো সম্বন্ধে তাকে অবহিত করা। সর্বোপরি, তার ভাল গুণ ও কাজকর্মকে সম্মান জানানোর বিশেষ প্রয়োজন আছে। এতে তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বাড়বে ও হীনমন্যতায় ভোগার আশঙ্কা কমবে।

কিশোর কিশোরীদের জীবনে এক সঙ্গে অনেক কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় এবং তাদের কোপিং স্কিল (coping skill, অর্থাৎ পরিস্থিতির

সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা) পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। তাই অনেকসময় রাগ প্রকাশকেই তারা দুঃখ, মানসিক আঘাত বা উদ্বেগ থেকে বাঁচার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তারা যদি নিজেদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করে তখন তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তারা অসংযত আচরণ করে ফেলে। যেহেতু বয়সোচিত কারণে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ ও নিয়ম ভাঙার একটা প্রবণতা দেখা যায়, তখন তাদের মধ্যে অনেকে অসামাজিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সেই জন্য অভিভাবকদের কখনও তাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তারা কোন দোষ যদি করেও ফেলে তখন সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অতিরিক্ত শাসন আপনার সন্তানকে আপনার কাছ থেকে দূরে নিয়ে চলে যাবে এবং তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তা হলে প্রশ্ন হল, দোষ করলে আমরা কি তা না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাব? সেটাও কখনও কাম্য নয়। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানাতে হবে, যে কাজটা তারা করেছে সেটা সমর্থনযোগ্য নয় এবং কেন নয় তাও তাকে জানাতে হবে। ওকে আগে বোঝাতে হবে যে ওর ভুল কোথায় হয়েছে। মনে রাখবেন যে কোন মানুষ তখনি তার ভুল সংশোধন করতে পারে যখন সে তার ভুল কোথায় হচ্ছে সেটা বুঝতে পারে।

প্রত্যাশা ও বাস্তব : সন্তানের কাছে বাবা মার প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু সে প্রত্যাশা যেন কখনই লাগামছাড়া ও অবাস্তব না হয়। বাবা মা বলেই যে সন্তানকে সব সময় তাদের অযৌক্তিক শাসন মেনে চলতে হবে তা এই বয়সের ছেলে মেয়েদের কাছে আশা না করাই ভালো। অযৌক্তিক শাসন মেনে না নেওয়ার সাহস সে দেখাতেই পারে। তাই নিজেদের এ ব্যাপারে সংযত করা বিশেষ দরকার।

বয়ঃসন্ধিকালে যৌনতার প্রতি একটা স্বাভাবিক কৌতূহল তৈরি হয়। সে কৌতূহলকে দোষ না ভেবে সেটা যে স্বাভাবিক— সেটা কিন্তু মা-বাবার বুঝতে হবে। তবে হ্যাঁ, কৌতূহলটুকু স্বাভাবিক মানে এই নয় যে সন্তানের যৌন আচরণ সবকিছুই স্বাভাবিক ধরে নিতে হবে। বাবা-মাও একদিন এই বয়স পার করে এসেছেন। তাঁরা যে ভাবে সেই প্রবণতাকে সামলেছেন, বা আজ এই বয়সে এসে মনে হয় যে ভাবে সামলালে ভালো করতেন, সেই পথ নিজের সন্তানটিকে দেখান। তাকে এ ব্যাপারে অকারণ দোষারোপ করবেন না। খেলাধুলা বা অন্যান্য সৃষ্টিমূলক কাজে তাদের উৎসাহ দিতে হবে কারণ এই বয়সে সব সময়ে নতুন কিছু করার এক স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের অফুরন্ত এনার্জিকে সঠিক পথে চালিত করার কাজে অভিভাবকই হতে পারেন তার সব থেকে কাছের বন্ধু— ফ্রেন্ড, ফিলজফার এন্ড গাইড।

অভিভাবকদের উচিত তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো বেশ কিছুটা সময় কাটানো। তাদের বন্ধুদের গল্প শোনা। অনেক রঙিন স্বপ্ন ওদের দুচোখে আঁকা আছে। তার হদিস মা বাবা যদি জানেন, তাহলে কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তা না করে কেবল শাসন করে তাকে দূরে ঠেলে দিলে, বয়সের ধর্মে সে যদি কোন ভুল করে ফেলে তাহলে কি সে দায়িত্ব তার একার?

এখন পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তাতে বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক প্রবণতার কথা আলোচনা করা হল। কিন্তু যদি দেখা যায় কিশোর বয়সের ছেলেটি বা মেয়েটি বেশিরভাগ সময় ঘরে একলা কাটাচ্ছে, সামাজিকভাবে একেবারেই মেলামেশা করতে চাইছে না, তার খিদে ও ঘুম কমে গেছে, কথায় কথায় কান্নার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, পড়াশুনোয় ফল খারাপ হচ্ছে তা হলে তার অভিভাবকের উচিত এ ব্যাপারে অবশ্যই কোন মনোবিদের সাহায্য নেওয়া।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ। কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে এছাড়াও যুক্ত আছেন কর্পোরেট সেক্টরে।

ক্যুইজ

১০ নং পাতার উত্তর

উত্তর :
১। ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া,
২। প্রধানত রক্তনালী সঙ্কোচনের ফলে রক্তসঞ্চালন কম হয় বলে ঘা শুকোতে দেরী হয়,
৩। ডাক্তার জেমস ব্লান্ডেল,
৪। অ্যান্টিবায়োমা,
৫। হারপিস জেনিটালিস,
৬। রুবেলা,
৭। সেরাম ফেরিটিন,
৮। মেয়র রোকিটানস্কি কার্টার হসার সিন্ড্রোম,
৯। হাইডাটিফর্ম মোল,
১০। হিপোক্রেটিস,
১১। অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডিলাইটিস,
১২। ইন্ট্রা-ইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস,
১৩। যথাক্রমে অবতল ও উত্তল লেন্স,
১৪। ক্যালাজিয়ন,
১৫। পাইকা।

রক্ত নিয়ে

জীবন গাথা - মরণকথা

(পর্ব ১)

রক্তদান মহাদান এটা আমরা সবাই জানি, ২৩শে বা ২৬শে জানুয়ারি কিংবা ১৫ই আগস্ট পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়, আমরা অনেকেই গিয়ে রক্ত দিই, তারপর লাল কার্ড আর এক প্যাকেট খবার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। কিন্তু কেন দিলাম বা যা দিলাম, সেটা নিয়ে কি করা হল সে সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা খুব বেশি মানুষের বোধহয় নেই। তা ছাড়া, আমি চাইলেই কি রক্ত দিতে পারি? এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গেলে প্রায় একটি মহাভারত লিখতে হয়, কিন্তু বুঝতে চাইলে বোধ হয় পুরোটাই বোঝা উচিৎ। তাই আসুন, একটা চেষ্টা করা যাক, বলছেন ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম প্রশ্ন, রক্ত দিতে হবে কেন? উত্তর খুব সোজা। রক্ত এখনও পর্যন্ত কারখানায় তৈরি করা যায় নি। রক্ত পুরোটা না হোক, রক্তের লোহিত রক্তকণিকা তৈরির চেষ্টা পৃথিবী জুড়েই চলছে, চলছে আমাদের ভারতেও। কিন্তু সে প্রচেষ্টা গবেষণাগারের চৌকাঠ পেরিয়ে রোগীর কাছে পৌঁছতে ঢের দেরি, ততদিন তো আর মৃতপ্রায় রোগী অপেক্ষা করে থাকতে পারেন না। সুতরাং কানু বিনে গীত নাই, রক্ত বিনে গতি নাই।

রক্ত-সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যাগ

রক্ত কী, তার কাজ কী?

রক্ত জিনিসটা কী, আর তা কী কাজে লাগে? ছোটো করে কেবল মূল কাজটা বলি, যেটা রক্তদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাজের কথা। রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন এবং খাদ্য দেহের সমস্ত কোষগুলিতে পৌঁছয়। হৃৎপিণ্ড পাম্প করে শরীরের সর্বত্র রক্ত পৌঁছিয়ে দেয়। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে ৫ লিটার আর একজন নারীর শরীরে ৪.৫ লিটার রক্ত থাকে।

রক্তের দুটো অংশ—জলীয় অংশ (প্লাজমা) আর কোষ সমূহ (লোহিত কণিকা, শ্বেত-কণিকা আর অণুচক্রিকা)। যদি কোনও কারণে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়, তা হলে সেই জল দেহের মধ্যে পুনরায় ঢুকিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। জল কিন্তু সব সময়ে 'জল' হয়ে বেরোয় না। আন্ত্রিক রোগে জল বেরোয় পাতলা মলের মধ্যে দিয়ে, বমিতে বেরোয় খাদ্য আর পাকস্থলীর রসের সঙ্গে। আবার শরীরের কোনও অংশ পুড়ে গেলে তা রসের মতো (যেমন পোড়া ফোস্কায় দেখা যায়) বেরিয়ে আসে, আর তারপর পোড়া ত্বকের যেহেতু জলকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা কম তাই রক্তরস ও দেহরস পোড়া ত্বকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। দেহ থেকে পালানো জল দেহের মধ্যে পুনরায় ঢুকিয়ে দেওয়া না দিলে খুব বিপদ, নইলে রক্তের (জলীয় অংশের) পরিমাণ কমে যাবে, ফলে রক্তের চাপও কমে যাবে। এর ফলে দেহের জরুরী সব প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ হবে না—ঠিক যেমন টালার ট্যাঙ্কে জল কম থাকলে পাড়ার কলে জল কম যায়, প্রত্যেক বাড়ি প্রয়োজনীয় জল পায় না।

রক্তের চাপ আচমকা কমে যাওয়া ও তারপর শরীরের প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক পরিঘটনাটিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষায় 'শক' বলা হয়। রক্তের পরিমাণ কমে যাবার ফলে শক হতে পারে, আবার অন্য কারণেও হতে পারে। এই শকের সঙ্গে বিদ্যুতের শকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু এটা একই রকম বিপজ্জনক। যথাসময়ে চিকিৎসা শুরু না করলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। এই ধরনের অবস্থার চিকিৎসার মূল স্তম্ভ হল শরীরে জলীয় পদার্থের অভাব পরিপূরণ করা। অভাব যদি কম হয়, তাহলে মুখেই জলীয় জিনিস, যেমন, নুন-লেবু-চিনির সরবত, ডাবের জল, প্রভৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা যদি বেশি খারাপ হয়, তখন আর মুখে খাওয়ানোর ভরসা না করে শিরার ভিতর সূচের মাধ্যমে জল ঢোকাতে হবে। আর শুধু জলতো ঢোকানো হয় না, দেওয়া হয় 'স্যালাইন'। জলের সঙ্গে লবণ মেশালে সেটাকে স্যালাইন বলে। অনেক ক্ষেত্রে রক্ত দেবার প্রশ্নই নেই—যেমন সাধারণ আন্ত্রিক রোগে তো শরীর থেকে রক্ত বেরোয় না, বেরোয় জল আর নানা লবণ—দেহরসে মিশে থাকা এই লবণগুলোকে এককথায় বলে ইলেকট্রোলাইটস—সেক্ষেত্রে শরীরে জল আর লবণ (ইলেকট্রোলাইটস) মুখে খাইয়ে, বা বাড়াবাড়ি ক্ষেত্রে শিরার মধ্যে দিয়ে 'স্যালাইন' চালিয়ে, দিতে হয়। বা দেওয়া হয় আরও ঘন জিনিস, যেমন এক ধরণের পলিগ্লেইন (Hemaccel এই ট্রেডনামে একটি পলিগ্লেইন এদেশে খুব চালু) যা রক্তরসের পরিমাণ স্যালাইনের চাইতে বেশি কার্যকরভাবে বাড়ায় —কিন্তু যেখানে রক্তের সত্যিই দরকার সেখানে এদের কোনটাই রক্তের সব কাজ করতে পারে না।

কেটে গিয়ে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেলে, বা অপারেশনের সময়, শরীর থেকে রক্তরস ও রক্তকোষ সবই বেরিয়ে যায়, তখন 'স্যালাইন' বা এইমাত্র যার কথা বললাম সেই পলিগ্লেইন, বা রক্ত থেকে তৈরি প্লাজমা—এইসব দিয়ে বড়জোর সাময়িক শক কাটানোর কাজ চলতে পারে, কিন্তু শেষমেশ রক্তই দিতে হয়। কেননা রক্তের মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন যা অক্সিজেন বহন করে ফুসফুস

> যখন শকের কারণ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, তখন স্যালাইন দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে না, রক্তই দিতে হবে।

থেকে নানা দেহকোষে পৌঁছে দেয়; এই হিমোগ্লোবিন এখনও কোনও কৃত্রিম উপায়ে কারখানায় প্রস্তুত করা যায় না। অথচ দেহে

হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হলে দেহকোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে কাজ করতে পারবে না, এমনকি অতিরিক্ত অক্সিজেন ঘাটতি হলে মস্তিষ্কের কোষের মতো কিছু কোষ আছে যারা একেবারে মারা যাবে। এছাড়াও রক্তে আছে নানা প্রোটিন ইত্যাদি যা দেহের নানা কাজের জন্য খুব দরকার—এদের হয়তো কারখানায় তৈরি করা যায়, কিন্তু তা ভয়ানক রকমের খরচসাপেক্ষ। যখন শকের কারণ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, তখন স্যালাইন দিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে না, রক্তই দিতে হবে।

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসাতেও কোনও কোনও সময় লোহিত কণিকা দিতে হয় রোগীকে, সেও তো রক্ত থেকেই আসে। অ্যানিমিয়ার জন্য আমাদের দেশে রক্তও দেওয়া হয় বহুক্ষেত্রে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়—সেই প্রসঙ্গে পরে আসব। এ ছাড়া রক্ত থেকে তৈরি করা বিভিন্ন অংশও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় অপরিহার্য এবং সেগুলিও কোনও ওষুধ কোম্পানি আজও তৈরি করতে পারে নি। সুতরাং, কেন রক্ত দরকার, তার উত্তর বোধ হয় এবার মোটামুটি পাওয়া গেল।

কিন্তু রক্ত দিতে পারি কি? আমার কি সেই যোগ্যতা আছে?

রক্তদানের ব্যাপারে কী করণীয় আর কী করা যাবে না, অর্থাৎ Dos and don’ts ঠিক করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আর International Society of Blood Transfusion and Immunohematology (ISBTI)। রক্ত নেওয়া হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যিনি দিচ্ছেন তাঁর কাছ থেকেই, আরও পরিষ্কার ভাবে বললে বলতে হয় যিনি অর্থের বিনিময়ে রক্ত বিক্রি করছেন তাঁর রক্ত নৈব নৈব চ, কারণ অর্থোপার্জনের তাগিদে যিনি রক্ত বিক্রি করছেন তিনি নিজের অসুস্থতা সংক্রান্ত তথ্যাদি গোপন করতে পারেন, যদি সেগুলির ভিত্তিতে তাঁর রক্ত না নেওয়া হয় সেই ভয়ে। সুতরাং যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সেগুলিই রক্তের প্রধানতম উৎস, এছাড়া রোগীর আত্মীয় বা বন্ধুদের থেকে রক্তও অনেক সময় নেওয়া হয়ে থাকে।

রক্ত সংগ্রহের সময় দাতার যাবতীয় তথ্যাবলী রেকর্ড করতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে ওই দাতাকে যোগাযোগ করা যায়। এছাড়াও ওই তথ্যকে ‘তথ্যব্যাঙ্ক’ হিসেবে ব্যবহার করা যায় জনসাধারণের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নানা রোগ ইত্যাদি জানার (Demographic) প্রয়োজনে। কিন্তু দাতার গোপনীয় কোনও ব্যাপার প্রকাশ করা যাবে না। যেমন কোনও দাতার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাঁর এইচ-আই-ভি সংক্রমণ আছে। এইচ-আই-ভি হল সেই ভাইরাস যার সংক্রমণের ফলে এইডস হয়। এইডস নিয়ে আমাদের সমাজে ভীষণ আতঙ্ক রয়েছে, কারো এইডস হয়েছে জানতে পারলে

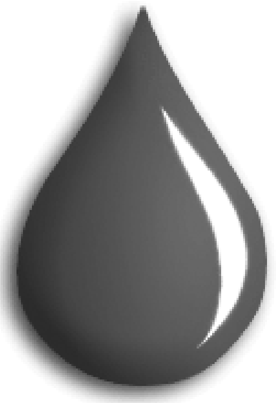

তাঁকে সামাজিকভাবে ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়। দাতার রক্ত পরীক্ষা করে তাঁর এইচ-আই-ভি সংক্রমণ আছে দেখা গেলে কখনই সেটা কাউকে বলা চলবে না; খালি তাঁর রক্তটা নষ্ট করে ফেলতে হবে, কেননা সেই রক্ত কেউ নিলে তাঁর এইচ-আই-ভি সংক্রমণ হতে পারে।

রক্তের গ্রুপ বিভাগ

সব রক্তের রংই লাল। অভিজাতরা যা-ই বলুন, পৃথিবীতে নীল রক্ত কোনোও মানুষেরই হয় না। কিন্তু রক্তের মধ্যে ছোটো বড়ো বিভিন্ন সিস্টেম, সব মিলিয়ে প্রচুর গ্রুপ আছে—রীতিমতো দলবাজি, একে অন্যের সঙ্গে মেশে না। ABO সিস্টেম অনুযায়ী A, B, O, AB এই চার রকমের গ্রুপ আর Rh সিস্টেম অনুযায়ী Rh+ve ও Rh-ve (Rh positive ও Rh negative) এই দুই গ্রুপ। ABO ও Rh —এই দুটিই হল সর্বাধিক দরকারি ‘মেজর’ গ্রুপ যা রক্তদান ও রক্তগ্রহণের সময় পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এগুলো বাদ দিয়ে আরও একাধিক মাইনর গ্রুপ আছে, যেমন, Lewis, MNS, Ss, P, KELL, Duffy, KIDD, প্রভৃতি; এগুলো বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পরীক্ষা করে নির্ণয় করা হয় না। কিন্তু যেহেতু এইসব মাইনর গ্রুপের কারণেও রক্তগ্রহণের সময় ঝামেলা হতে পারে, তাই ABO ও Rh সিস্টেম অনুযায়ী গ্রুপ মেলানোর পরেও দাতা ও গ্রহীতার রক্ত সব সময়েই ক্রস ম্যাচ করে দেখে নেওয়া হয়। অর্থাৎ যদি A+ গ্রুপের রক্ত প্রয়োজন হয়, ব্লাড ব্যাঙ্কে A+ গ্রুপের যে রক্ত আছে তার নমুনার সঙ্গে গ্রহীতার রক্তের নমুনা মিলিয়ে কোনো রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিনা দেখে তবেই সেই রক্ত ইসু করা হয়; এভাবেই ওই মাইনর গ্রুপ-জনিত প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায়। অর্থাৎ O Rh-ve গ্রুপ মানে সার্বিক দাতা (Universal donor), তাঁর রক্ত সব্বাইকে দেওয়া যাবে, আর AB Rh+ve গ্রুপ মানে সার্বিক গ্রহীতা (Universal recipient), তিনি সবার রক্ত গ্রহণ করতে পারবেন নিরাপদে, ব্যাপারটা এরকম সোজা নয়, যদিও আমাদের স্কুল-পাঠ্য টেক্সট বইয়ে এমন কথা এখনও লেখা থাকে।

রক্তের এই গ্রুপ বিভাগের মূল কারণ হল লোহিতকণিকার গায়ে লেগে থাকা অ্যান্টিজেন—যে অ্যান্টিজেন আছে সেটার নামেই গ্রুপ-এর নাম। আর যে অ্যান্টিজেন নেই, তার বিপরীত অ্যান্টিবডি থাকে প্লাজমা বা রক্তরসে। অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি হল প্রোটিন—এক অ্যান্টিজেন তার বিপরীত অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও অ্যান্টিজেনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই একই দেহে এক অ্যান্টিজেন তার বিপরীত অ্যান্টিবডির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে না। ক্ষতিকর জীবাণুর শরীরের বিভিন্ন প্রোটিনকে আমাদের দেহ অ্যান্টিজেন বলে চিহ্নিত করতে পারে আর তার বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে—এটা

অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি হল প্রোটিন—এক অ্যান্টিজেন তার বিপরীত অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও অ্যান্টিজেনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই একই দেহে এক অ্যান্টিজেন তার বিপরীত অ্যান্টিবডির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে না।

আমাদের রোগজীবাণুদের হাত থেকে বাঁচার এক রাস্তা। কিন্তু রক্তের গ্রুপের ক্ষেত্রে এই উপকারী গুণটিই অপকারী রূপে দেখা দেয়। এক মানুষের রক্তের রক্ত-গ্রুপের প্রোটিনটি অন্য মানুষের কাছে অ্যান্টিজেন বলে চিহ্নিত হয়, ও সেই রক্ত-গ্রুপের প্রোটিনটি ধ্বংস করার জন্য রক্তগ্রহীতার অ্যান্টিবডি চেষ্টা করে। A গ্রুপের রক্তে আছে A অ্যান্টিজেন,

B অ্যান্টিজেন নেই, অতএব রক্তরসে আছে anti-B অ্যান্টিবডি। B গ্রুপের রক্তে আছে B অ্যান্টিজেন, A অ্যান্টিজেন নেই, অতএব রক্তরসে আছে anti-A অ্যান্টিবডি। সুতরাং A গ্রুপের রক্তের সঙ্গে যদি B গ্রুপের রক্ত মেশানো হয়, তাহলে বিপরীতধর্মী অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি মুখোমুখি আসবে, বিক্রিয়া করবে, ও তার ফলে রক্তের লোহিতকণিকাগুলি ধ্বংস হবে, কারণ অ্যান্টিজেনগুলি লোহিতকণিকার গায়েই অবস্থিত।

Rh সিস্টেমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ABO সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম—যে অ্যান্টিজেন লোহিতকণিকার গায়ে আছে বিপরীত অ্যান্টিবডি একই শরীরে থাকে না; আর যে অ্যান্টিজেন নেই তার বিপরীত অ্যান্টিবডি থাকে। সেইভাবে Rh অ্যান্টিজেন যাঁর রক্তে আছে অর্থাৎ যিনি Rh+ve তাঁর রক্তে anti-Rh অ্যান্টিবডি থাকবে না, ঠিক যেরকম ABO সিস্টেমের ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু যিনি Rh-ve, তাঁর রক্তেও anti-Rh অ্যান্টিবডি প্রাথমিক ভাবে থাকে না—অর্থাৎ তাঁর Rh অ্যান্টিজেন বা anti-Rh অ্যান্টিবডি কিছুই নেই। ফলে Rh+ve ব্যক্তিকে Rh-ve রক্ত নির্ভয়ে দেওয়া যাবে। বাস্তবে অবশ্য এটা করা হয় না, কারণ সেটা হবে মূল্যবান জিনিসের অপচয়, যেহেতু এই Rh-ve গ্রুপের রক্তে সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু উল্টোটা? মানে Rh-ve ব্যক্তিকে Rh+ve রক্ত দিলে কি হবে? ABO গ্রুপের মতো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হবে না, কিন্তু অচেনা প্রোটিন অ্যান্টিজেনের সঙ্গে মোলাকাত হবার পরে ধীরে ধীরে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। ভবিষ্যতে যদি কখনও এই শরীর আবার Rh+ve রক্ত ঢোকে তাহলে সহজেই প্রতিক্রিয়া হবে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া রক্ত গ্রহণের (Blood Transfusion) এর সবচেয়ে আলোচিত সমস্যা, কিন্তু সেটা যে সাধারণ মানুষ পুরো বোঝেন তা নয়। তাই সেটা দিয়েই শুরু করা যাক। লোহিত কণিকার গায়ের কিছু প্রোটিন অণু দ্বারা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় হয়। আর একবার বলি, লোহিত কণিকার গায়ে A অ্যান্টিজেন থাকলে তাঁর রক্তের গ্রুপ A; B অ্যান্টিজেন থাকলে গ্রুপ B; A এবং B দুটি অ্যান্টিজেন-ই থাকলে গ্রুপ AB, আর দুটির কোনোটাই না থাকলে গ্রুপ O। এই গ্রুপ বাবা ও মায়ের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পাই, জন্মের কিছুকাল পরে এই গ্রুপের অ্যান্টিজেনগুলি পুরোমাত্রায় বিকশিত হয়। কিন্তু গ্রুপের বিপরীত অ্যান্টিবডিগুলি শরীরে তৈরি হয় নানাধরণের খাবার ও জীবাণুর প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। এইসব খাবার আর জীবাণুর অ্যান্টিজেনগুলির ধর্ম অনেকটা রক্তের গ্রুপের অ্যান্টিজেনগুলির মতো, তাই এরকম হতে পারে। আমরা আগেই দেখেছি, রক্তে যে গ্রুপের অ্যান্টিজেন আছে, তার ঠিক বিপরীত অ্যান্টিবডিটি থাকে না।

রক্তের গ্রুপ	রক্তের লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	জন্মের ঠিক পরে রক্তরসে অ্যান্টিবডি	পরবর্তী জীবনে রক্তরসে অ্যান্টিবডি
গ্রুপ A	A	নেই	অ্যান্টি B
গ্রুপ B	B	নেই	অ্যান্টি A
গ্রুপ AB	A	নেই	নেই
গ্রুপ O	নেই	নেই	অ্যান্টি A এবং অ্যান্টি B

কোনো মানুষকে তার নিজের ABO ও Rh গ্রুপের রক্তই দিতে হবে, অন্যথায় গ্রহীতার রক্তের অ্যান্টিবডি দাতার রক্তের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দাতার লোহিত কণিকাগুলিকে ভেঙ্গে ফেলবে (Hemolysis)। এই ঘটনার লক্ষণগুলি রক্তদান শুরু করার অব্যবহিত পরেই দেখা যাবে, প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হবে, রোগীর খুব শীত লাগবে ও জ্বর আসবে। এই ধরনের লক্ষণসমূহ দেখা গেলেই তৎক্ষণাৎ রক্তদান বন্ধ করতে হবে, না হলে লোহিত কণিকাগুলি ভাঙতেই থাকবে এবং তার ফলে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই বিক্রিয়াটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় শুধু রক্তের গ্রুপ ঠিকঠাক নির্ণয় করে, গ্রহীতার রক্তের নমুনার সঙ্গে দাতার রক্তের নমুনা মিশিয়ে ক্রস-ম্যাচিং ঠিকভাবে করে, এবং দাতা ও গ্রহীতার নামের লেবেল লাগাতে যাতে কোনো ভুল না হয় সেই দিকে নজর দিয়ে। একই ভাবে যখন রক্ত দেওয়া হবে তখন ডাক্তার ও নার্সদের রোগীর নাম ও রক্তের ব্যাগের গায়ের নামের লেবেল ভালো ভাবে মিলিয়ে তবেই রক্ত দিতে হবে। এই খুব সাধারণ সাবধানতাগুলি অবলম্বন করলেই অনেক বড় বিপদ এড়ানো যায়।

ABO গ্রুপ ও Rh গ্রুপ হল রক্তের একাধিক গ্রুপের প্রধান গ্রুপ, অন্য কম প্রধান গ্রুপগুলি দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা হিসেবের মধ্যে আনা হয় না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলি ঝামেলা করতে পারে। আগেই বলেছি, ক্রস-ম্যাচিং-এর দ্বারা সেই ঝামেলা সহজেই এড়ানো যায়।

ABO গ্রুপ ও Rh গ্রুপ হল রক্তের একাধিক গ্রুপের প্রধান গ্রুপ, অন্য কম প্রধান গ্রুপগুলি দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা হিসেবের মধ্যে আনা হয় না

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া শুধু যে লোহিতকণিকার উপর হয় তা নয়, শ্বেতকণিকা বা অনুচক্রিকার উপরও হতে পারে এবং তার ফলেও রোগীর জ্বর হতে পারে। এছাড়া রক্তরসের মধ্যে থাকা বিভিন্ন প্রোটিনের কারণে অ্যালার্জি তৈরি হয়ে জ্বর, গায়ে লাল র‍্যাশ প্রভৃতি হতে পারে। রক্ত ঠিক তাপমাত্রায় না রাখলে, বা খুব সরু সূচের ভিতর দিয়ে রোগীর শরীরে ঢোকালে লোহিতকণিকাগুলি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে রক্তের গ্রুপ-ঘটিত বিক্রিয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তবু এটুকু বলা যায় যে রক্তদানের অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি খুবই বিপজ্জনক কিন্তু যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করলে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব।

Rh গ্রুপের মূল গুরুত্ব

এতক্ষণ ABO গ্রুপ নিয়েই বেশি বললাম, হয়তো আপনারা ভেবে নিয়েছেন Rh গ্রুপ ব্যাপারটা 'মাইনর', তার তেমন গুরুত্ব নেই। Rh গ্রুপের মূল গুরুত্ব খুব বেশি, কিন্তু সেটা রক্তদান-গ্রহণ ছাড়াও আরেকটা অন্য জায়গায়— সন্তানধারণের ক্ষেত্রে। একজন Rh+ve মহিলা প্রথমবারের জন্য অন্তঃসত্বা হলেন, এবং তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের রক্তের গ্রুপ Rh+ve। আগেই বলেছি, এক্ষেত্রে মায়ের Rh-ve রক্তেও anti-Rh অ্যান্টিবডি প্রাথমিক ভাবে থাকে না— অর্থাৎ তাঁর Rh অ্যান্টিজেন বা anti-Rh অ্যান্টিবডি কিছুই নেই। মায়ের শরীরের Rh-ve রক্ত গর্ভের সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে, তাকে

লালনপালন করে। কিন্তু সন্তানের Rh+ve রক্ত মায়ের শরীরে বিশেষ প্রবেশ করে না, একেবারে গর্ভাবস্থার শেষ দিক ছাড়া। শেষের দিকে যখন জরায়ু ও সারা শরীর প্রস্তুত হচ্ছে সন্তানের ভূমিষ্ঠ

Rh গ্রুপের মূল গুরুত্ব খুব বেশি, কিন্তু সেটা রক্তদান-গ্রহণ ছাড়াও আরেকটা অন্য জায়গায়— সন্তানধারণের ক্ষেত্রে।

হওয়ার জন্য, তখন গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা ধীরে ধীরে খুলে আসতে শুরু করে এবং তখনই সন্তানের Rh+ve রক্ত একটু একটু করে মায়ের শরীরে ঢুকতে শুরু করে। মায়ের শরীর তখন এই নতুন প্রোটিন অ্যান্টিজেনের মোকাবিলা করতে অ্যান্টিবডি তৈরি করা শুরু করে।

এই প্রসঙ্গে একটু জেনে রাখতে হবে, আমাদের শরীর যখনই কোনো অ্যান্টিজেনের সঙ্গে প্রথমবার পরিচিত হয় তখন প্রথমে IgM type অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তৈরি হওয়ার হার অপেক্ষাকৃত ধীরগতির, এবং খুব বেশি পরিমাণে IgM অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না। তবে শরীরের ইমিউনিটির দায়িত্বে থাকা কোষেরা অবাঞ্ছিত বহিরাগতকে ভালোভাবেই চিনে রাখে, যাতে ভবিষ্যতে মোকাবিলার প্রয়োজন ঘটলে পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। পরবর্তীকালে যখন সত্যিই ফের মুখোমুখি হতে হয়, তখন IgG type অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বিপুল পরিমাণে আর সেটা ঘটে খুব দ্রুত। প্রথম প্রেগন্যান্সিতে যখন অ্যান্টিবডি তৈরি শুরু হয়, তা স্বাভাবিক ভাবেই IgM type, এটির সাইজ অনেক বড়ো, ফলে প্লাসেন্টা পেরিয়ে শিশুর শরীরে যেতে পারে না, ফলে শিশুর ক্ষতি তেমন হয় না। IgG type অ্যান্টিবডি সাইজে ছোটো, তা প্লাসেন্টা পেরতে পারে, কিন্তু পুরোমাত্রায় IgG type অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়ার আগেই সাধারণত প্রথম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় এবং তার কোনও ক্ষতি হয় না।

কিন্তু এই মা যদি দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করেন এবং সেই ভ্রূণটিও যদি Rh+ve হয়, তাহলে গর্ভস্থ শিশুর শরীর থেকে একটি বা দুইটি লোহিতকণিকাও যখন মায়ের শরীরে প্রবেশ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শরীরে বিপুল পরিমাণে IgG type অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এবং তা প্লাসেন্টা পেরিয়ে শিশুর শরীরে ঢুকে শিশুর লোহিতকণিকাগুলিকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এই শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই, বস্তুত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জন্ডিস দেখা দেয় ও হিমোগ্লোবিন কম থাকে। লোহিতকণিকাগুলি ধ্বংস হলে তৈরি হয় বিলিরুবিন, এটি স্বাভাবিক শরীরেও ঘটে। কিন্তু দ্রুত অনেক লোহিতকণিকা ধ্বংস হলে দ্রুত অনেক বিলিরুবিন তৈরি হয়। আর সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় বিলিরুবিনের মাত্রা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে, কারণ সেই শিশুর কচি লিভার এই বিলিরুবিনের প্রবল ভার সামলাতে পারে না। বিলিরুবিন যদি ২০ মিলিগ্রামের বেশি হয় তবে তা মস্তিষ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং সে ক্ষতির কোনো চিকিৎসা হয় না, অর্থাৎ অপূরণীয় ক্ষতি বা irreversible damage। এই মহিলা যদি তৃতীয় বার একই ভাবে Rh+ve শিশুকে গর্ভে ধরেন, তাহলে IgG type অ্যান্টিবডি আরও আগে আগে তৈরি হওয়া শুরু হয়, শিশুর ক্ষতিও হয় অনেক বেশি মাত্রায়, ভীষণ রক্তাল্পতা নিয়েই জন্মায়, তাকে বাঁচানো কঠিন হয় এবং অনেক সময়েই গর্ভের মধ্যেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে।

ধান ভানতে শিবের এই গীত গাইলাম শুধু একটি কথাই বোঝাতে যে, রক্তের গ্রুপ সঠিক ভাবে নির্ণয় করে Rh+ve বা Rh-ve চিহ্নিত করা ভীষণ জরুরী। কোনোভাবেই Rh-ve মানুষকে, বিশেষ করে কোনো Rh+ve রক্ত না দেওয়া হয় সেটা দেখতেই হবে, কারণ সেই ভুলের মাশুল তাঁকে সারাজীবন ধরে দিতে হতে পারে। গর্ভধারণের আগেই যদি কোনো Rh-ve মহিলাকে Rh+ve রক্তে দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তীকালে তিনি Rh+ve শিশুকে গর্ভে ধারণ করলে প্রথম শিশুরও প্রবল ক্ষতি হয়ে যাবে।

রক্তের গ্রুপ মেলানো রক্তগ্রহণের জন্য খুব জরুরি, কিন্তু তা বলে আমাদের অন্য ঝুঁকিগুলো ভুলে গেলে চলবে না। সে ব্যাপারে আসব স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরবর্তী সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, ডি সি পি, এম ডি, কলকাতার একটি সরকারী মেডিকাল কলেজে প্যাথোলজি বিভাগের অধ্যাপক।

একক মাত্রা

advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

এইড্‌স নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর

এইড্‌স কথাটা শুনলে অনেকে আতঙ্কিত হন। অনেকের ধারণা এটা ক্যানসারের মতোই এক মারণব্যাধি। আবার অনেকের ধারণা এটা ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। তাই অনেকে এইড্‌স রোগীর ধার মাড়াতে চান না, ছোঁয়া তো দূরের কথা। এই ধারণা সাধারণ মানুষের মতো অনেক চিকিৎসকের মধ্যেও রয়েছে। তাই এইড্‌স আক্রান্ত রোগীরা সহজে চিকিৎসা পান না। এ রোগ সম্বন্ধে আরও অনেক ভুল ধারণা, ভয়, ভ্রান্তি রয়েছে অনেকের মনে। বর্তমান নিবন্ধে এ রোগের কারণ, উৎপত্তি, বিস্তার, সংক্রমণের ধারা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের আকারে জানা-অজানা অনেক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনে এইড্‌স আক্রান্ত রোগীরা করুণা নয়, সহযোগিতা ও জীবনের মূলস্রোতে ফেরার সুযোগ পাবেন— লিখছেন **ডা. পি কে দাস**।

প্র ঃ এইচ আই ভি কী?

উঃ হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস বা এইচ আই ভি হচ্ছে এক ধরনের ভাইরাস যেটা এইড্‌স রোগের কারণ। এই ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্তজনিত পদার্থের মধ্যে দিয়ে ও যৌন সঙ্গমের মাধমে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও সংক্রামিত গর্ভবতী মহিলার দেহ থেকে এই ভাইরাস গর্ভাবস্থায় কিম্বা প্রসবকালীন সময়ে সন্তানের দেহে ও মায়ের দুধ সেবনের মধ্যে দিয়েও সংক্রামিত হতে পারে। যে সমস্ত লোকের মধ্যে এই এইচ আই ভি ভাইরাস পাওয়া যায় তাঁরা এইচ আই ভি সংক্রামিত বলে ধরে নিতে হবে। এবং এঁদের বেশিরভাগই এইড্‌স রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সমস্ত দেহরসের মাধ্যমে এইচ আই ভি বিস্তার লাভ করে সেগুলি হল— রক্ত, বীর্য, নারীর যৌননালীর রস, বুকের দুধ, অন্যান্য দেহরস যেখানে রক্ত সংমিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক সময় কিছু দেহরসের সংস্পর্শে আসেন যেখান থেকে এইচ আই ভি ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে বিস্তার লাভ করতে পারে। সেগুলি হল— সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড যেটা মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকান্ডকে বেষ্টন করে থাকে, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যেটা অস্থি-সংযোগস্থলে থাকে ও ভ্রূণ বেষ্টিত করে থাকে যে রস সেই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড।

প্র ঃ এইড্‌স কী ও এর কারণ কী?

উ ঃ এইড্‌স কথাটার অর্থ হল একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। একজন এইচ আই ভি সংক্রামিত ব্যক্তিকে এইড্‌স রোগে আক্রান্ত বলে তখনই ধরে নেওয়া হবে যখন অসুখটির কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষণ তাঁর দেহে দেখা যাবে। এছাড়া একজন এইচ আই ভি সংক্রামিত ব্যক্তির দেহে আপাতদৃষ্টিতে কোনো অসুখের লক্ষণ দেখা না দিলেও তাঁকে এইড্‌স রোগী বলা যেতে পারে যদি তাঁর রক্তপরীক্ষায় সি ডি-৪ (CD4+) কোষ গণনায় অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। অর্থাৎ রোগীর দেহ পরীক্ষায় এইচ আই ভি ভাইরাস পাওয়া গেলেও তাঁকে এইড্‌স রোগী বলা যাবে না; যদি না ডাক্তারি পরীক্ষায় বেশ কয়েকটি অসুস্থতার লক্ষণ তাঁর দেহে দেখা দেয়। এগুলোকে এইড্‌স প্রকাশক রোগ বা এইড্‌স ইন্ডিকেটর ইলনেস বলে। এইচ আই ভি সংক্রমণ হলে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর সুযোগ নিয়ে কিছু সুযোগ-সন্ধানী জীবাণু, পরজীবী দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও দুর্বল রোগীকে অসুস্থ করে দেয়।

এইড্‌স কথাটার অর্থ হল একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম। একজন এইচ আই ভি সংক্রামিত ব্যক্তিকে এইড্‌স রোগে আক্রান্ত বলে তখনই ধরে নেওয়া হবে যখন অসুখটির কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষণ তাঁর দেহে দেখা যাবে।

প্র ঃ কোথা থেকে এল এই ভাইরাস?

উ ঃ এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক জানা নেই। এ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে নানা মতভেদ। ১৯৫৯ সালে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর কিনসাসা শহরে প্রথম জনৈক ব্যক্তির রক্তে এইচ আই ভি ভাইরাস পাওয়া যায়। কিভাবে তিনি সংক্রামিত বলেন সেটা জানা যায় নি। ভাইরাসের জেনেটিক কোড অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন আনুমানিক ১৯৪০ কিম্বা ১৯৫০-এর গোড়াতে এই ভাইরাসের উৎপত্তি। এর পরে ১৯৭০-এর মাঝামাঝি ও শেষের দিকে আমেরিকায় এই ভাইরাসের সন্ধান মেলে। ১৯৮১ সালে লস এঞ্জেলেসের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা কিছু বিরল নিউমোনিয়া ও ক্যানসার রোগের ধরন লক্ষ্য করেন নিউইয়র্কের কতিপয় সমকামী পুরুষদের মধ্যে। এই রোগগুলি বিরল বলা যায়, কেন না স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন লোকেদের মধ্যে এর প্রভাব দেখা যায় না। ১৯৮২ সালে জনস্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকেরা এই রোগটিকে একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা এইড্‌স বলে নামকরণ করেন। ১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানীরা এইড্‌স রোগ যে ভাইরাস ঘটিত সেই ভাইরাস পৃথকীকরণ করেন। তবে ভাইরাসের প্রথম নাম ছিল এইচ টি এল ভি ৩/ এল এ ভি। পুরো নাম হিউম্যান টি সেল লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস টাইপ-৩ বা লিমফ-এডিনোপ্যাথি এসোসিয়েটেড ভাইরাস। আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক কমিটি এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন এইচ আই ভি (HIV)।

প্র ঃ এইচ আই ভি ভাইরাস কিভাবে এইড্‌স রোগ সৃষ্টি করে?

উ ঃ এইচ আই ভি ভাইরাস দেহের শ্বেত রক্তকণিকার লিম্ফোসাইট কোষের একটা ধরন সি

এইচ আই ভি ভাইরাস দেহের শ্বেত রক্তকণিকার লিম্ফোসাইট কোষের একটা ধরন সি ডি-৪ কোষ— একে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলে। এরা আমাদের দেহে সহায়ক কোষ হিসেবে পরিচিত। এর ফলে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়।

ডি-৪ কোষ— একে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলে। এরা আমাদের দেহে সহায়ক কোষ হিসেবে পরিচিত। এর ফলে দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক লোকের রক্তে এইচ আই ভি ভাইরাস বহুদিন বাসা বেঁধে রয়েছে অথচ এইড্স রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, কেন না ততদিন পর্যন্ত ঐ ভাইরাস দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পুরোপুরি বিনষ্ট করতে পারে নি। সেটা যখনই বিনষ্ট হবে তখনই এইড্স রোগের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে দেখা যাবে। এটা পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণিত যে রক্তের মধ্যে এইচ আই ভি ভাইরাস ও সি ডি-৪ কোষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এইচ আই ভি-র সংখ্যা যতই বাড়বে রক্তের মধ্যে সি ডি-৪ কোষের সংখ্যা ততই কমতে থাকবে ও রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে।

প্র ঃ এইচ আই ভি ভাইরাস দেহের মধ্যে ঢোকার পরে রোগ সৃষ্টি করতে কতদিন সময় লাগে?

উ ঃ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৯৯২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে এইচ আই ভি ভাইরাস দেহে ঢোকার পরে মোটামুটি ১০ বছরের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে থাকে। তবে মানুষভেদে ও দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী এই সময়টা কম বেশি হতে পারে। তবে এটা সত্য যে আজকাল বেশ কিছু ভাল ভাল ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে এই সময়কালটা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে। যদি এইচ আই ভি সংক্রমণের সনাক্তকরণ খুব তাড়াতাড়ি করা যায় তবে রোগলক্ষণ ফুটে ওঠা অনেকদিন আটকে রাখা যায়।

প্র ঃ কিভাবে সংক্রামিত হয় এই ভাইরাস?

উ ঃ এইচ আই ভি ভাইরাস সংক্রামিত হয় বীর্যরস, স্ত্রী দেহের যৌননালীর রস, এবং রক্ত ও রক্তজাত পদার্থের মাধ্যমে। শিরার মধ্যে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, অসুরক্ষিত যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে ও সংক্রামিত মায়ের দেহ থেকে নবজাতকের দেহে প্রসবকালীন সময়ে এটা ঘটতে পারে। হাতে হাত রাখলে, সাধারণভাবে চুম্বন করলে, মশা কিম্বা অন্য কীট-পতঙ্গের কামড়ে, জলবাহিত কিম্বা বায়ুবাহিত হয়ে এইচ আই ভি সংক্রামিত হয় না। আবার যথাযথ ভাবে পরীক্ষা না করে অন্যের রক্ত গ্রহণ করলে রক্তদাতার রক্তের মাধ্যমে এইচ আই ভি ছড়াতে পারে।

প্র ঃ উঠতি বয়েসি ছেলেমেয়েদের কিভাবে এই রোগ থেকে বাঁচানো যায়?

উ ঃ বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে সচেতন করা দরকার। কেন না এই বয়সেই যৌন উদ্দীপনা তাদের মধ্যে মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই সময় থেকে বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পারিবারিক চিকিৎসক সকলের একটা দায়িত্ব রয়েছে তাদের বোঝানো ও ঠিক পথে পরিচালনা করার। যৌনসঙ্গী একাধিক হলে বিপদ, কন্ডোম অনেকটা সুরক্ষা দেয়— এসব তথ্য তাদের জানা দরকার।

প্র ঃ মায়ের দুধের মধ্যে দিয়ে কি এইচ আই ভি সংক্রামিত হতে পারে?

উ ঃ হ্যাঁ পারে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত যে সংক্রামিত মায়ের দেহ থেকে বুকের দুধের মাধ্যমে সন্তানের দেহে এইচ আই ভি আসতে পারে। প্রশ্ন হল— তবে শিশু জন্মের পর কী করা উচিত, কেন না মায়ের দুধের বিকল্প কিছু নেই। আবার মায়ের দুধের মাধ্যমে যেসব রোগ থেকে বাচ্চাকে সুরক্ষিত করা যায় অন্য দুধের মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। তাই এই ধরনের শিশুর ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেই শিশু কতটা পরিমাণ সংক্রামিত মায়ের দুধ খাবে ও কতটা পরিমাণ বিকল্প দুধ খাবে। এ ব্যাপারে পরে আরও প্রশ্নোত্তর রয়েছে।

সরকারি সাহায্য ছাড়া এ ওষুধ যোগাড় করা এদেশের অধিকাংশ মানুষের সাধ্যের অতীত।

প্র ঃ রক্ত-গ্রহণ, ইঞ্জেকশন নেওয়া, হাতে উল্কি আঁকা অথবা কান বেঁধানোর মাধ্যমে কি এইড্স হতে পারে?

উ ঃ সবগুলোর উত্তর একটাই— হ্যাঁ হতে পারে। রক্তদাতার রক্তের মধ্যে এইচ আই ভি ভাইরাস থাকলে সঞ্চালনের মাধ্যমে তা গ্রহীতার শরীরে সংক্রামিত হতে পারে। তাই রক্ত দেওয়া বা নেওয়ার সময় ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে সেই রক্তে এইচ আই ভি আছে কিনা। থাকলে সেই রক্ত বাতিল করে দিতে হবে। তেমনি

এইচ আই ভি ভাইরাস সংক্রামিত হয় বীর্যরস, স্ত্রী দেহের যৌননালীর রস, এবং রক্ত ও রক্তজাত পদার্থের মাধ্যমে। শিরার মধ্যে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, অসুরক্ষিত যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে ও সংক্রামিত মায়ের দেহ থেকে নবজাতকের দেহে প্রসবকালীন সময়ে এটা ঘটতে পারে।

কান বেঁধানো ও উল্কি আঁকার ছুঁচ ইত্যাদি ভালোভাবে পরিশোধিত করে নিতে হবে— সেটা কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ করা হয় না।

প্র ঃ এইড্স রোগের কি কোনো চিকিৎসা আছে?

উ ঃ আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখন অনেক ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, এইড্স রোগের মোকাবিলায় অসুবিধা হল এই ওষুধগুলো খুব ব্যয়বহুল ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত। আজকাল একটিমাত্র ওষুধ ব্যবহার না করে একের অধিক প্রয়োগ করা হচ্ছে এইচ আই ভি ভাইরাসকে দ্রুত বিনাশ করার জন্য। সাফল্যও ভালো হচ্ছে, তবে সাধারণের নাগালের বাইরে। সরকারি সাহায্য ছাড়া এ ওষুধ যোগাড় করা এদেশের অধিকাংশ মানুষের সাধ্যের অতীত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জোর দিয়েছে ওই রোগের চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে সুযোগ-সন্ধানী জীবাণু বা পরজীবীর চিকিৎসার উপর। বিশেষ করে এই রোগে সুযোগ-সন্ধানী জীবাণুর আক্রমণে যক্ষ্মা ও উদারাময় দেখা দেয়— এদের চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমিষ জাতীয় খাবার, শাক-সব্জি, লেবু ও বিভিন্ন ফল খাওয়া দরকার।

প্র ঃ এই রোগের কি কোনো টীকা আছে?

উ ঃ এখনো পর্যন্ত টীকা বেরোয় নি, তবে বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও উগাভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাজ চলছে পুরোদমে। এশিয়ার থাইল্যান্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে টীকা পরীক্ষার কাজ খুবই ফলপ্রসূ

এখনো পর্যন্ত টীকা বেরোয় নি

হয়েছে। তবে এটা পুরোপুরি চালু হতে আরও ৪-৫ বছর লাগবে। তখন বোঝা যাবে মানুষের ক্ষেত্রে এটা কতটা ফলদায়ী। আমাদের দেশেও এ ধরনের টীকার আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু সেটা এখনো পরীক্ষাগারে সীমিত রয়েছে। আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে এটা ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হবে।

প্র ঃ অন্যান্য যৌনরোগ কি এইচ আই ভি বিস্তারে সাহায্য করে?

উ ঃ অবশ্যই। কেন না বিভিন্ন ধরনের যৌনরোগ যৌনাঙ্গের চামড়া ও ঝিল্লির ক্ষতি করে। এর ফলে এইচ আই ভি দেহের মধ্যে অবাধে ঢুকে যেতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক যৌনরোগ হল ঃ সিফিলিস, শ্যাংক্রয়েড, জেনিটাল হারপিস, গনোরিয়া।

প্র ঃ যৌনরোগের চিকিৎসা করালে এইচ আই ভি সংক্রমণ কমানো যাবে?

উ ঃ যেহেতু বিভিন্ন ধরনের যৌনরোগ এইচ আই ভি সংক্রমণে সাহায্য করে তাই যৌনরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ও তাঁর যৌনসঙ্গীদের চিকিৎসা করাটা খুবই জরুরী। এইভাবে দু'জনের এইচ আই ভি ঠেকানো যাবে।

প্র ঃ যুবক যুবতীদের মধ্যে কিভাবে এইচ আই ভি ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যায়?

উ ঃ যুবক যুবতীদের জানা দরকার কিভাবে এই রোগ যৌনকর্মের মাধ্যমে ছড়ায়। উঠতি বয়সে যেহেতু যৌন উন্মাদনা জাগে, অথচ মানসিক পরিপক্কতা থাকে না, এই বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্ক হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া সূঁচ দিয়ে ইঞ্জেকশন করে কিছু কিছু মাদক গ্রহণের ঘটনা এই বয়সে বেশি ঘটে। যেহেতু একই সূঁচ জীবাণুমুক্ত না করে বারবার বিভিন্নজন ব্যবহার করেন, এতে এইচ আই ভি ছড়াতে পারে। তাই মাদকবিরোধী অভিযান এবং এই ধরনের মাদকাসক্তদের মধ্যে যথাযথ সূঁচ ব্যবহার করার শিক্ষা এইচ আই ভি ঠেকাতে পারে।

এইচ আই ভি পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যত্র ভ্রমণ, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, নিশ্চিত আশ্রয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুযোগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে।

প্র ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি এইচ আই ভি এইড্‌স সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন তাদের কি কোনো বিশেষ অধিকার বা দায়িত্ব রয়েছে?

উ ঃ এইচ আই ভি পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই হোক না কেন প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যত্র ভ্রমণ, বিবাহ, সামাজিক নিরাপত্তা, নিশ্চিত আশ্রয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুযোগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে। কেউ যাতে সামাজিক নিপীড়ন করতে না পারে সে ব্যাপারে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তাঁদের আছে। অন্যদিকে এইড্‌স আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও দায়িত্ব আছে নিরাপদ যৌনজীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া ও অন্যদের ক্ষতিসাধন না করা।

প্র ঃ এইচ আই ভি সংক্রমণের ব্যাপারে কি সাধারণ কাজের জায়গাগুলো নিরাপদ?

উ ঃ এইচ আই ভি সংক্রমণ হয় যৌন রস কিম্বা রক্তের মাধ্যমে এবং বেশিরভাগ কাজের পরিবেশে এধরনের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা নেই, তাই এইচ আই ভি সংক্রমণের আশঙ্কাও নেই। এমনকি কাজের পরিবেশে যেখানে একসঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে কাজ করতে হয়, জনবহুল কারখানায়, হয়তো কখনো চায়ের পেয়ালা ভাগ করে খাওয়া হয়, একই টেলিফোন রিসিভার নিয়ে কথা বলা হয় সেখানেও কোনো সুযোগ নেই এইচ আই ভি সংক্রমণের।

প্র ঃ কাজের পরিবেশে কোথায় এইচ আই ভি সংক্রমণের আশঙ্কা আছে?

উ ঃ কাজের পরিবেশে যেখানে রক্তের সংস্পর্শে আসতে হয় যেমন চিকিৎসক, দাঁতের ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি কর্মী এদের কিছুটা ঝুঁকি থাকে। তাই এঁদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করাটা খুবই প্রয়োজন।

যেহেতু বিভিন্ন ধরনের যৌনরোগ এইচ আই ভি সংক্রমণে সাহায্য করে তাই যৌনরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ও তাঁর যৌনসঙ্গীদের চিকিৎসা করাটা খুবই জরুরী। এইভাবে দু'জনের এইচ আই ভি ঠেকানো যাবে।

প্র ঃ কোনো রোগী যাঁর এইচ আই ভি আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাঁর রক্ত ইত্যাদি যদি ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর দেহে দুর্ঘটনাবশত প্রবেশ করে তবে কি করণীয়?

উ ঃ পি ই পি হল পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস অর্থাৎ হঠাৎ অনবধানতা বা দুর্ঘটনাবশত যদি কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাঁকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কিছু ওষুধ খাওয়ানো। সাধারণত ডাক্তার, নার্স, সাফাইকর্মী ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে জড়িত সবারই এই ভয় থাকে। শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে এমন সূঁচ ফুটে গেলে, কাটা বা ক্ষত আছে এমন জায়গায় রোগীর দেহরস বা রক্ত লাগলে এই সম্ভাবনা থাকে। প্রথমেই সংস্পর্শে আসা জায়গাটা সাবান দিয়ে ধুতে হবে। পি ই পি খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে যেমন যে রোগীর সংস্পর্শে এই ঘটনা ঘটেছে তাঁর এইচ আই ভি রিপোর্ট জানা সম্ভব কিনা, কি পরিমাণ ও কিভাবে সংস্পর্শ ঘটেছে ইত্যাদি বিচার করে ২ ঘন্টার মধ্যেই জিডাভুডিন ও ল্যামিভুডিন ওষুধ শুরু করা উচিত। দিনে দু'বার করে একমাস পর্যন্ত একটানা খেতে হবে। সংস্পর্শের ৭২ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ওষুধ শুরু করতে হবে। হাসপাতালে ইমারজেন্সি বিভাগে সবসময় এই ওষুধ মজুত রাখার কথা।

পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস অর্থাৎ হঠাৎ অনবধানতা বা দুর্ঘটনাবশত যদি কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশের কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাঁকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কিছু ওষুধ খাওয়ানো।

প্র ঃ কোনো একজন কর্মী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে কি তাঁর এইচ আই ভি স্ট্যাটাস জানাবেন?

উ ঃ এটা জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যদি তাঁর মনে হয় তিনি এইচ আই ভি পজিটিভ বলে তাঁর কোনো কোনো কাজকর্ম

অন্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও নৈতিক বোধ থেকে গোপনীয়তা বজায় রেখে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে পজিটিভ স্ট্যাটাস জানানোই উচিত।

প্র ঃ বিদেশে বেড়ানোর সময় কি এইচ আই ভি সংক্রমণ হতে পারে?

উ ঃ পাশে বসা, হাত ধরা, হাঁচি-কাশি, গাড়িতে চড়া, জলের জগ ব্যবহার করা, বাথরুম, টয়লেট ব্যবহার করা, সুইমিংপুলে সাঁতার কাটা এসবের মাধ্যমে এইচ আই ভি সংক্রমণ হয় না, সুতরাং দেশে বা বিদেশে বেড়ানোর সময় এমনিতে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেখানে কোনো এইচ আই ভি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌনাচার করলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও প্রাইভেট হাসপাতাল যেখানে ভি সি টি সি সেন্টার (ভেনারেল ডিজিজ কাউন্সেলিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার) রয়েছে সেখানেই এইচ আই ভি পরীক্ষা করা যায়।

প্র ঃ একজন এইচ আই ভি সংক্রামিত ব্যক্তি কি বিদেশে বেড়াতে যেতে পারে?

উ ঃ কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল এইচ আই ভি মুক্ত শংসাপত্র। এটা কোনো কোনো দেশের ইমিগ্রেশন আধিকারিক দেখতে চান। এ ব্যাপারে যিনি ট্রাভেল কাউন্সেলর আছেন তাঁর পরামর্শ মত চলতে হবে।

প্র ঃ দেহ নিঃসৃত রস যেমন লালা কি নিরাপদ?

উঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে দেহ নিঃসৃত রস যেমন লালা, মল, মূত্র, চোখের জলে খুব অল্প পরিমাণ এইচ আই ভি থাকে। তবে এর দ্বারা এইচ আই ভি সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবু এগুলি যাতে আমাদের রক্ত বা ক্ষত বা শ্লেষ্মাঝিল্লির সংস্পর্শে না আসে সেটুকু সতর্কতা নেওয়াই ভালো।

পায়ুসঙ্গমে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

প্র ঃ মুখ সঙ্গম কি নিরাপদ নয়?

উ ঃ কোনো ব্যক্তির যৌনাঙ্গকে চুম্বন লেহন ইত্যাদি করলে যৌনাঙ্গ থেকে এইচ আই ভি মুখবিবরে গিয়ে অন্য ব্যক্তির এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটাতে পারে; আবার মুখবিবর থেকে ভাইরাস যৌনাঙ্গে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। যৌনাঙ্গে ক্ষত, মুখে বা মাড়িতে ক্ষত থাকলে এই সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

প্র ঃ পায়ুসঙ্গম কি এইচ আই ভি আনতে পারে?

উ ঃ সত্যি কথা বলতে কি পায়ুসঙ্গমে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি।

প্র ঃ কিভাবে বলতে পারি একজন ব্যক্তি এইচ আই ভি পজিটিভ?

উ ঃ একজন ব্যক্তির রক্তের এইচ আই ভি অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ঐ ব্যক্তির এইচ আই ভি পজিটিভ। এটাকে কেউ কেউ এইচ আই ভি পরীক্ষা বা এইড্‌স পরীক্ষা বলেন, কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষা কখনোই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে না যে তাঁর এইড্‌স হয়েছে। এই পরীক্ষায় শুধুমাত্র প্রমাণিত হয় যে ঐ ব্যক্তির রক্তের মধ্যে এইচ আই ভি ভাইরাস রয়েছে ও তিনি অপর কোনো ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে এই পরীক্ষায় কখনো কখনো জোর দিয়ে সদুত্তর দিতে পারা যায় না, অর্থাৎ তাঁর শরীরে এইচ আই ভি ভাইরাস আছে কিনা সেটা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন পর পর পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পর পর পরীক্ষায় নেগেটিভ হলে তবেই বলা যায় তিনি এইচ আই ভি মুক্ত।

প্র ঃ যদি একজন ব্যক্তি এইচ আই ভি পজিটিভ হন তাঁর কী করা উচিত?

উ ঃ প্রথমেই উচিত হল একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যিনি তাঁর দৈহিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত উপদেশ দেবেন ও ভবিষ্যৎ চিকিৎসার পরিকল্পনা তৈরি করে দিতে পারবেন। চিকিৎসক তাঁর দেহে অন্যান্য যৌনরোগের জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন, টিবি বা কোনো সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ আছে কিনা দেখবেন। যৌনসঙ্গীকে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে জানানো হল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। সেই যৌনসঙ্গীকে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে ও বিভিন্ন সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার— যেমন যৌন সঙ্গমের সময়ে সবসময় কন্ডোম ব্যবহার করতে হবে এবং তাঁর যৌনসঙ্গীরও কন্ডোম ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের মাদক ওষুধ, মদ পরিহার করতে হবে। ভালো পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম কিম্বা মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সময় বন্ধু ও পরিবার আত্মীয়-স্বজনের আন্তরিক সাহায্য দরকার। সর্বোপরি দরকার একজন অভিজ্ঞ কাউন্সেলরের সাহায্য। যাঁরা এ রোগে ভুগছেন তাঁদেরও সাহায্য ও সমর্থনও এ সময় কাজে লাগে। রক্তদান, প্লাজমাদান, বীর্যদান, দেহদান অথবা অন্যকোনো উপাঙ্গদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্র ঃ এইচ আই ভি আক্রান্ত হওয়ার পরে মানুষ কেন মারা যায়?

উ ঃ এইচ আই ভি সংক্রমণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে নানা ধরনের সুযোগ-সন্ধানী জীবাণু, ভাইরাস, পরজীবী ইত্যাদির আক্রমণে মানুষ মারা যায়। এছাড়া এইড্‌স রোগীদের বিভিন্ন ক্যানসার হতে পারে। সেই জন্যে মানুষ মারা যায়।

প্র ঃ এইচ আই ভি আক্রান্তদের চিকিৎসায় সি পি টি বা কোট্রাইমোক্সাজল প্রোফাইল্যাক্সিস-এর ভূমিকা কি?

উ ঃ সি পি টি হল কোট্রাইমক্সাজল প্রোফাইল্যাক্সিস থেরাপি অর্থাৎ আগে থেকে কোট্রাইমক্সাজল ওষুধ খাওয়ালে এইড্‌স রোগীর শরীরে অনেক সুযোগ-সন্ধানী জীবাণুর আক্রমণ আটকানো যায়।

প্র ঃ একজন এইচ আই ভি দ্বারা আক্রান্ত হলে পরবর্তী সময়ে তাঁর কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে?

উ ঃ এইচ আই ভি সংক্রমণে অনেক সময় দেখা যায় বহুদিন (১০-১২ বছর) যাবৎ তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো এইড্‌স রোগের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নয়, কিন্তু তুলনায় তাড়াতাড়ি দেখা দিতে পারে। যেমন হঠাৎ করে দেহের ওজন কমে যাওয়া, বহুদিন ধরে একটানা শুকনো কাশি, বারে বারে জ্বরে ভোগা ও রাত্রে প্রচুর ঘাম হওয়া, দেহের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্লান্তি যার কোনো ব্যাখ্যা নেই, লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি, বারে বারে মলত্যাগ, একটানা কয়েক সপ্তাহ ধরে বারে বারে সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়ায় ভোগা ইত্যাদি। তবে এ ধরনের লক্ষণ দেখে

কারোরই ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তিনি এইড্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, কেন না অন্যান্য রোগেও এগুলো হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্র ঃ কোথায় এই ধরনের পরীক্ষা করা যায়?

উ ঃ জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ও প্রাইভেট হাসপাতাল যেখানে ভি সি টি সি সেন্টার (ভেনারেল ডিজিজ কাউন্সেলিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার) রয়েছে সেখানেই এইচ আই ভি পরীক্ষা করা যায়। এছাড়া কিছু প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতেও পরীক্ষা করানো যায়। ভি সি টি সি সেন্টারে পরীক্ষার আগে কাউন্সেলর প্রিটেস্টিং কাউন্সেলিং করিয়ে পরীক্ষা করান, পরীক্ষার পরে পোষ্ট টেস্টিং কাউন্সেলিং করা হয়।

প্র ঃ র‍্যাপিড টেস্ট পরীক্ষাটা কী?

উ ঃ এই পরীক্ষার ফলাফল জানা যায় ৫-৩০ মিনিটের মধ্যে অন্যদিকে এনজাইম ইমিউনো অ্যাসে, র‍্যাপিড ইমিউনো প্রেসিপ্রিটেশন অ্যাসে, ওয়েস্টার্ন ব্লট পরীক্ষা, লেটেক্স ইমিউনো অ্যাসে, অ্যামুষ্টিনেশন অ্যাসে, ডটব্লট ইমিউনো ব্লাইন্ডিং অ্যাসে, অ্যান্টিজেন র‍্যাপচার অ্যাসে, পলিমেশন চেন রিয়্যাকশন (পি সি আর) ইত্যাদি।

প্র ঃ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের কতদিন পরে এইচ আই ভি পরীক্ষা করা দরকার?

উ ঃ সম্ভাব্য যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের (অরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, সূঁচ ভাগাভাগি ইত্যাদি) ফলে দেহের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটলে একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে। সেই সময়টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিন মাসের মধ্যে, গড় সময় ২৫ দিন। কখনো কখনো এটা ৬ মাস লাগতে পারে, তবে সেটা খুবই বিরল ঘটনা। এই কারণে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সুপারিশ করেন যে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের ৬ মাস বাদে পরীক্ষা করালে ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে মন্তব্য করা সম্ভব। তবে সেই ব্যক্তিকে এই ৬ মাস সুরক্ষিত রাখতে হবে— এইচ আই ভি-র সংক্রমণ ঘটার মতো যেন কিছু না করা হয়।

প্র ঃ কোনো একজন ব্যক্তির এইচ আই ভি নেগেটিভ হলে তার যৌনসঙ্গীও কি এইচ আই ভি নেগেটিভ হবে?

উ ঃ অবশ্যই নয়। সেই ব্যক্তির এইচ আই ভি স্ট্যাটাস শুধু সেই ব্যক্তির জন্য, তাঁর যৌনসঙ্গী নেগেটিভ হবে কিনা বলা যাবে না। বলতে গেলে যৌনসঙ্গীর রক্ত পরীক্ষা করে বলতে হবে।

প্র ঃ এইচ আই ভি ওয়ান ও এইচ আই ভি টু-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উ ঃ সারা বিশ্ব জুড়ে দুই ধরনের এইচ আই ভি ভাইরাস পাওয়া যায়— এইচ আই ভি ওয়ান ও এইচ আই ভি টু। তার মধ্যে এইচ আই ভি ওয়ান-এর প্রার্দুভাব বেশি। দু'ধরনের ভাইরাসের সংক্রামিত হওয়ার পদ্ধতি একই, যৌন সঙ্গমে, রক্তজাত পদার্থের মাধ্যমে ও মা থেকে শিশুর মধ্যে। এদের রোগের লক্ষণও একই। তবে এইচ আই ভি টু-এর সংক্রামিত হওয়ার ঘটনা তুলনায় কম ও ইনকিউবেশন পিরিয়ড অর্থাৎ ভাইরাস শরীরে ঢোকার পর রোগলক্ষণ প্রকাশ পাবার সময় অনেকটাই বেশি লম্বা।

> এখনো পর্যন্ত এই রোগ সারিয়ে দেওয়ার মতো কোনো অস্ত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাতে নেই।

প্র ঃ এইচ আই ভি সংক্রমণে পি পি টি সি টি (PPTCT) ব্যাপারটা কী?

উ ঃ পি পি টি সি টি হল প্রিভেনসন অফ পেরেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অর্থাৎ এইচ আই ভি পজিটিভ গর্ভবতী মহিলার শিশুকে কিভাবে সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। মা যদি এইচ আই ভি এইড্স রোগের তৃতীয় অথবা চতুর্থ পর্যায়ে থাকেন অথবা সি ডি-৪ যদি ৩৫০-এর নীচে হয় তাহলে গর্ভকালীন যে কোনো অবস্থায় এ আর টি শুরু করা হয়। কিছুদিন আগেও এই সব মায়েদের সিজারিয়ান অপারেশন দ্বারা প্রসব করানোর নির্দেশ ছিল। এখন শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ প্রসবের সম্ভাবনা থাকলে চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিজার করা হয়। প্রসবের ৩ ঘন্টা আগে মাকে ৪০০ মিগ্রা নেভিরেপিন খাওয়ানো হয়— প্রসবে আরও দেরি হলে প্রতি ৩ ঘন্টায় আবার এই ওষুধ দেওয়া হয়। প্রসবের পর শিশুকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে নেভিরেপিন সিরাপ খাওয়ানো শুরু করা হয়, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত। ৬ মাস, ৯মাস, ১২ মাস ও ১৮ মাসে শিশুর এইচ আই ভি-র রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং রিপোর্ট অনুযায়ী এর পরের চিকিৎসা করা হয়।

প্র ঃ এদেশে মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের মাত্রা কী রকম? পি পি টি সি টি কর্মসূচীর লক্ষ্য কী?

উ ঃ পজিটিভ মা থেকে শিশুর মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি হল ৩০ শতাংশ। এদেশের নিরিখে মোট জনসংখ্যার যদি ০.৮ শতাংশ এইচ আই ভি পজিটিভ এমন ধরা হয় তবে ২ কোটি ৭০ লক্ষ প্রসবের মধ্যে ২ লক্ষ ১৬ হাজার গর্ভবতী এইচ আই ভি পজিটিভ হবেন। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে অঙ্কের হিসাবে প্রায় ৭০ হাজার শিশু এইচ আই ভি পজিটিভ হবে। এর ফল কিন্তু ভয়াবহ।

পি এম টি সি টি-র লক্ষ্য হল প্রথমত, ১৪-৪৯ বছর বয়সের গর্ভবতী মায়েদের এইচ আই ভি প্রিভ্যালেন্স অর্থাৎ মোট এক হাজার মানুষ পিছু এইচ আই ভি পজিটিভ মানুষের সংখ্যা নামিয়ে আনা। প্রথমে ৩ শতাংশের নিচে নামানো দরকার। দ্বিতীয়ত, মা থেকে শিশুর সংক্রমণের মাত্রা ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে আনতে হবে।

প্র ঃ এইচ আই ভি পজিটিভ মায়েদের তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওনোর ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকা কী?

উ ঃ ইউনিসেফ ও ন্যাকো-র এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বার্তা হল মা তাঁর শিশুকে ৪ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন। ৪ মাস পরে বিকল্প খাবার দিয়ে ৬ মাসের মাথায় বুকের দুধ পুরোপুরি বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হবে। এর ফলে বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর দেহে এইচ আই ভি সংক্রমণের হার কিছুটা কমবে। তবে মাকে এ ব্যাপারে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলা হবে যে বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর কিন্তু এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ব্যাপারে মায়ের কিছু মতামত থাকলে তা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে বিবেচনা করবেন ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

প্র ঃ অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধের ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকা কী?

উ ঃ সরকার নির্দেশিত এ আর টি সেন্টার থেকে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এইড্স আক্রান্ত রোগীদের অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধ দেওয়া হবে।

প্র ঃ ভাইরাস লোড টেস্ট কী জিনিস? কেন এটা করা হয়?

উ ঃ ভাইরাস লোড টেস্ট করা হয় রক্তে কত

পরিমাণ এইচ আই ভি ভাইরাস রয়েছে জানার জন্য। তবে এই টেস্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই পরীক্ষায় ফলাফল ১০ হাজারের নিচে থাকলে রক্তে কম ভাইরাস আছে এবং ১০ হাজারের উপরে থাকলে বেশি ভাইরাস আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এইড্‌স রোগীর অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধ খাওয়ানোর পরে ওষুধগুলো ঠিক মতো কাজ করছে কিনা জানার জন্য এটা করা হয়। ঠিক ঠিক কাজ করলে ভাইরাস লোড রক্তে কম থাকবে। বেশ কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি ভাইরাল লোড বেশি থাকে তবে প্রথম সারির ওষুধের জায়গায় দ্বিতীয় সারির ওষুধ প্রয়োগ করার কথা ভাবতে হবে। এছাড়া সি ডি ফোর (CD$_4$) সেল কাউন্টও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। তবে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি যে ভাইরাস লোডের পরিমাণ ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মধ্যে থাকলে তার মূল্যায়ন কি হতে পারে ভাইরাস লোড পরীক্ষায় ভাইরাস সংখ্যাটির চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কিছু সময় অন্তর করা দুটি টেস্টে সেই সংখ্যা কমছে না বাড়ছে।

প্র ঃ এইড্‌স রোগ কি সারে?

উ ঃ এখনো পর্যন্ত এই রোগ সারিয়ে দেওয়ার মতো কোনো অস্ত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাতে নেই। যেহেতু ওই রোগের কারণ ভাইরাস, সেই ভাইরাসের দ্রুত বৃদ্ধিকে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই এখন প্রথম উদ্দেশ্য। সুযোগ-সন্ধানী জীবাণুর ও এইড্‌স রোগীর ক্যানসারের যথাযথ চিকিৎসা করে শরীরকে সুস্থ রাখা হল চিকিৎসার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্র ঃ নবজাতকের কি এইচ আই ভি টেস্ট করা যেতে পারে?

উ ঃ করা যেতে পারে, কিন্তু এই পরীক্ষায় বলা যাবে না যে নবজাতক এইচ আই ভি সংক্রামিত। কেন না নবজাতক তার এইচ আই ভি পজিটিভ মায়ের কাছ থেকে জন্মসূত্রে এইচ আই ভি অ্যান্টিবডি পায়। ১৮ মাস বয়স পার হয়ে গেলে তার দেহে মায়ের দেহ থেকে পাওয়া এইচ আই ভি অ্যান্টিবডিগুলি থাকে না। সুতরাং এইচ আই ভি টেস্ট করতে হলে ১৮ মাস অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু আর একটি পরীক্ষা আছে— পি সি আর। এই পরীক্ষার দ্বারা জন্মের ৩ মাসের মধ্যে বলা যাবে শিশুর দেহের মধ্যে এইচ আই ভি আছে কিনা। এই পরীক্ষায় এইচ আই ভি-র বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা রক্তের অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয় না, তার বদলে এইচ আই ভি ভাইরাসের নিজস্ব জিন শিশুর দেহে আছে কিনা দেখা হয়। এই পরীক্ষা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল।

প্র ঃ গর্ভবতী মায়ের এইচ আই ভি পরীক্ষার সুবিধা কি কি?

উ ঃ গর্ভবতী কোনো মহিলার রক্ত পরীক্ষায় যদি এইচ আই ভি পাওয়া যায় তবে তার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে যার ফলে মায়ের থেকে বাচ্চার দেহে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি গর্ভাবস্থায় কিম্বা প্রসবের সময় অনেক কমে যাবে। এর পরে প্রসবের জন্য পরিকল্পনা মাফিক সিজারিয়ান সেকশন করে বাচ্চার সংক্রমণকে আরও অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া যাবে।

প্র ঃ সব গর্ভবতী মহিলাদের কি এই পরীক্ষা করা হয়?

উ ঃ সব গর্ভবতী মহিলাদের এইচ আই ভি পরীক্ষা করা হয় না। কিছু কিছু অ্যান্টি-ন্যাটাল ক্লিনিকে মায়েদের এই টেস্ট করানোর ব্যাপারে বুঝিয়ে বলা হয়, তার পরে তাঁর এই পরীক্ষায় সম্মতি আছে কিনা জানা হয়। যদি সম্মতি দেন তবেই পরীক্ষা করা হয়। সম্মতি ছাড়া কারোর পরীক্ষা করানো হয় না।

প্র ঃ যদি কোনো গর্ভবতী মহিলার পজিটিভ রেজাল্ট পাওয়া যায়, তখন কি করা হয়?

উ ঃ গর্ভবতী মহিলাকে চিকিৎসক কিম্বা নার্সের সঙ্গে পরামর্শ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকে নিতে বলা হয় এবং ঘন ঘন নজরদারি করার প্রয়োজন হয় যাতে তার বিশেষ মেডিকেল কেয়ার নিয়ে তাঁর গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে সংক্রমণের গতিকে শিথিল করে দেওয়া যায়। কোনো কোনো গর্ভবতী মহিলা ঠিক করেন শিশু সন্তান জন্মাবে ও পৃথিবীর আলো দেখবে সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা করা হয়। আবার কোনো মহিলা ঠিক করেন এরকম গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দেবেন তাদের ক্ষেত্রে আলাদা পরিকল্পনা। এছাড়া মনস্তাত্ত্বিক সাহায্যের কথাটাও ভাবা হয়।

লেখক পরিচিতি: ডা. পি কে দাস, এম বি বি এস, ডি টি এম অ্যান্ড এইচ, একজন জেনারেল ফিজিসিয়ান ও ট্রপিক্যাল রোগ বিশেষজ্ঞ।

advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

জননতন্ত্র ও যৌনাঙ্গের রোগ

সরকারি ব্যবস্থায় সংলক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসা

জননাঙ্গে কোনও সমস্যা হলে আমরা চট করে ডাক্তারের কাছে যেতে চাই না। আর যৌনরোগ নিয়ে যা গালগল্প, গুজব ও ভুল ধারণা চালু আছে তার ফলে যৌনাঙ্গে কিছু হলে যতদিন পারি ততদিন চেপে যাই, তারপর ল্যাম্পপোস্টে বা গণশৌচালয়ের গায়ে মারা ছাপা পোস্টার পড়ে চুপিসারে ঢুকে পড়ি লোক-ঠকানো হাতুড়ের ঘরে। মহিলা রোগী হলে তো তাঁর সমস্যা দশগুণ বেশি। অথচ নিখরচায় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে (Nation Rural Health Missionবা NRHM)২০০৫ সাল থেকে প্রজনন ও শিশুদের স্বাস্থ্যকে (Reproductive and Child Health বা RCH) বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে গিয়ে দেখা গেছে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা মায়ের জননতন্ত্রের সংক্রমণ। যেহেতু মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই জননতন্ত্র ও যৌনাঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত— এই সংক্রান্ত সব রকম সংক্রমণকেই বর্তমানে একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয় ও চিকিৎসার আওতাভুক্ত করা হয় (Reproductive Tract Infection বা RTI ও Sexual Tract Infectionবা STI)। এখনও বহু মানুষের ধারণা আছে— 'শুধু সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত অসুখই এই শ্রেণীভুক্ত এবং এইসব রোগ শুধু খারাপ লোকেদেরই হয়, আমাদের বাপু ওসব নিয়ে কিছু জানার দরকার নেই'। যদিও বা ওসব জায়গায় কোনও চুলকানি বা ঘা হল— এ নিয়ে কোনও কথা বলা বারণ! এমনকি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে কিছু একটা কিনে খাওয়া বরং অনেক স্বস্তিকর। এই ঢাক ঢাক গুড় গুড় আর ফিসফাসের ফলে অনেক সংক্রমণই ঠিকমত নির্ণীত হয় না ও চিকিৎসাও হয় না।

সমীক্ষায় দেখা গেছে STI/RTI সংক্রমণে ভুগছেন এরকম ১০০ জন মহিলার মধ্যে মাত্র ৫০ জনের শারীরিক লক্ষণ দেখা যায়। এই ৫০ জনের অর্ধেক অর্থাৎ ২৫ % রোগী চিকিৎসা করাতে যান। আবার তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ঠিক চিকিৎসা পান ও পুরো চিকিৎসা শেষ করেন। সুতরাং মাত্র ১-২ % রোগী চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত হন। বাকি সব রোগী তাঁর সঙ্গীকে সংক্রামিত করেন এবং নিঃশব্দে সমাজে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়। অথচ সামান্য চিকিৎসা দ্বারাই কিন্তু রোগমুক্ত হওয়া সম্ভব— তা হয় না শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে। এই সংক্রমণ শরীরে বহন করে চললে পুরুষ ও নারী উভয়েরই গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া এর ফলে HIV অর্থাৎ মারাত্মক এইড্স রোগের ভাইরাস সংক্রমণের হার বেড়ে যায়। গর্ভপাত ও গর্ভে শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ে— সব মিলিয়ে সমাজে নিঃশব্দে একটা ক্ষতি হতেই থাকে।

জননাঙ্গ/যৌনাঙ্গে সংক্রমণে সরকারি ব্যবস্থা

আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও যেহেতু সব রোগ খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয়ের সব প্রযুক্তি হাতের কাছে পাওয়া যায় না— খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রযুক্তি নির্ভরতা ছাড়াই যাতে জননাঙ্গ ও যৌনতন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা করা যায় সেরকম একটা ব্যবস্থা সরকারিভাবে বেশ কিছুদিন হল চালু করা হয়েছে। যৌন ও জননতন্ত্রের সংক্রমণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে অনেকগুলো অসুখের লক্ষণ প্রায় এক এবং যে লক্ষণগুলো রোগী সহজে চিনতে পারে; আর শুধু ডাক্তার নন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীও যে লক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে রোগীদের সচেতন ও চিহ্নিত করতে পারেন। প্রয়োজন মত স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারেন আর ডাক্তার সেই লক্ষণ অনুযায়ী চিহ্নিত ওষুধের প্যাকেট দিয়ে খুব সহজেই এইসব রোগের চিকিৎসা করতে পারেন।

দেখা গেছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া মিলিয়ে মোট ৩৫ রকমের জীবাণু দ্বারা যৌনাঙ্গ ও জননতন্ত্রের সংক্রমণ সম্ভব। জননতন্ত্রের সংক্রমণ হয় ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা, উপযুক্ত ভাবে জীবাণুমুক্ত না করা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা এবং ঝুঁকিপূর্ণ যৌনসংসর্গের মাধ্যমে। আর যৌনতন্ত্রের সংক্রমণ হয় প্রধানত ঝুঁকিপূর্ণ যৌনসংসর্গের মাধ্যমে। এছাড়া সংক্রমণযুক্ত রক্ত পরিভরণ (ব্লাড ট্র্যান্সফিউসন), অন্যের ব্যবহার করা ছুঁচ ও সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন নেওয়া সংক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গর্ভবতী সংক্রমিত মা-র থেকে শিশুরও সংক্রমণ ঘটে।

লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসা

যে লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসার কথা আগে বলা হল এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। যৌন ও জননতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য মোট সাত ধরনের ওষুধের প্যাকেট বা 'কিট'-এর ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেকটা প্যাকেটের রঙ আলাদা করা হয়েছে যাতে কোনো ভুল না হয় এবং প্রয়োজনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসেও এইসব রোগের চিকিৎসা করা যায়—

কোন্ সংলক্ষণ, কী চিকিৎসা?

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে একটু প্রশিক্ষণ থাকলেই এই সাতটি 'কিট' দ্বারা প্রায় সব রকমের যৌনসংক্রমণের চিকিৎসা সম্ভব। এবার লক্ষণের সূত্র ধরে ব্যাপারটা আরও একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়া যাক। যৌন ও জননতন্ত্রের সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাতটি 'কিট'-এর মত রোগীরা প্রধানত ছয়টি লক্ষণ নিয়েই আসতে পারেন— তখন কিভাবে চিকিৎসা এগোবে তার সূত্র মোটামুটি এই রকম ঃ—

এক. যোনিপথের ক্ষরণ (vaginal discharge)**—** মহিলারা সবচেয়ে বেশি এই লক্ষণ নিয়ে আসেন। রোগিনীর অনুমতি নিয়ে স্পেকুলাম দিয়ে ভিতরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যোনিমুখে কোনো ক্ষরণ বা ক্ষত আছে কিনা। যোনিমুখে ক্ষত ছাড়া শুধু ক্ষরণ থাকলে কিট-১ আর শুধু যোনিপথে ক্ষরণ থাকলে কিট-২ দিতে হবে।

কিট (Kit)	কিট-এর রঙ	কী কী ওষুধ থাকে	কোন্ সংলক্ষণে দেওয়া হয়
কিট-১	ধূসর (gray)	অ্যাজিথ্রোমাইসিন ১ গ্রাম ও সেফিক্সিম ৪০০ মিগ্রা একটা করে ট্যাবলেট রোগী দুটি ট্যাবলেট পর পর খাবেন।	জরায়ুমুখের ক্ষরণ, মূত্রনালীর ক্ষরণ, পায়ুর ক্ষরণ, অন্ডকোষ ফোলা।
কিট-২	সবুজ (green)	সেকনিডাজোল২ গ্রাম ফ্লুকোনাজোল-এর ট্যাবলেট থাকে দুটো ওষুধই একবারে খেতে হয়।	যোনিপথের ক্ষরণে এই কিট খেতে হয়।
কিট-৩	সাদা (wh)	অ্যাজিথ্রোমাইসিন ২ গ্রাম ট্যাবলেট ও বেঞ্জাথিন পেনিসিলিন ২.৪ মেগা ইউনিট একটা ইঞ্জেকশন।	যৌনাঙ্গের ক্ষত থাকলে এবং সেই ক্ষত যৌনাঙ্গের হারপিসজনিত ক্ষত না হয় তাহলে এই কিট খেতে দেওয়া হয়।
কিট-৪	নীল (blue)	ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিগ্রা করে দিনে দু'বার ১৪ দিন ও অ্যাজিথ্রোমাইসিন একটা ট্যাবলেট।	কিট-৩ যেখানে দেবার কথা সেরকম যৌনাঙ্গে ক্ষতযুক্ত রোগী যার পেনিসিলিনে অ্যালার্জি আছে তাকেই এই কিট ক্ষেতে দেওয়া হয়, কিট-৩ এর পরিবর্তে।
কিট-৫	লাল (red)	অ্যাসাইক্লোভির ৪০০ মিগ্রার ২১টি ট্যাবলেট থাকে দিনে তিনবার করে সাতদিন খেতে হয়।	যৌনাঙ্গের হারপিসের চিকিৎসায় এই কিট ব্যবহার করা হয়।
কিট-৬	হলুদ (yellow)	সেফিক্সিম ৪০০ মিগ্রার একটা ট্যাবলেট থাকে যা তৎক্ষণাৎ খেতে হয়। মেট্রোনিডাজোল ৪০০ মিগ্রা ও ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিগ্রা ২৮টি করে থাকে একটা করে দিনে দু'বার ১৪ দিন খেতে হয়।	মহিলাদের তলপেটে ব্যথার লক্ষণ থাকলে।
কিট-৭	কালো (black)	অ্যাজিথ্রোমাইসিন ১ গ্রাম ট্যাবলেট থাকে যা তৎক্ষণাৎ খেতে হয়। ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মিগ্রা ৪২টি ট্যাবলেট থাকে যা রোজ ১টি করে দু'বার খেতে হয়।	কুঁচকিতে গ্ল্যান্ড ফোলার লক্ষণ থাকলে এই কিট দেওয়া হয়।

এছাড়া যৌনাঙ্গে খোস, আচিল, মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম ভাইরাসজনিত রোগগুলো সংক্রামক বলে একই ভাবে একজনের থেকে অন্য যৌনসঙ্গীর মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং রোগ অনুযায়ী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো কিট নেই।

দুই. মূত্রনালী/পায়ুর ক্ষরণ(Urethral/Anal Dischrge)— প্রথমে কিট-১ দ্বারা গনোরিয়া ও ক্ল্যামিডিয়া সংক্রমণের চিকিৎসা করা হয়। লক্ষণ না কমলে সাতদিন পরে উচ্চতর হাসপাতালে বিস্তারিত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগনির্ণয়ের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তিন. অন্ডকোষ ফোলা (Sctotal Swelling)— এক্ষেত্রেও কিট-১ দ্বারা প্রথমে চিকিৎসা করা হয়। সাতদিনের মধ্যে না কমলে উচ্চতর হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

চার. তলপেটে ব্যথা— এটা একটা অতি সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু STI/RTI চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই লক্ষণকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় মহিলাদের PID বা Pelvic Inflammatory Disease -এর কথা ভেবে। তলপেটে মূলত জননাঙ্গের এই সংক্রমণ বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা হতে পারে এবং আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়। যদি ঋতুচক্রের ইতিহাস স্বাভাবিক থাকে, মহিলা গর্ভবতী না হন,

তলপেটে কোনো শক্ত মাংসপিন্ড জাতীয় (mass)বস্তু হাত দিয়ে অনুভব করা না যায় তাহলে কিট-৬ খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু তলপেটে ব্যথা যেহেতু অন্য অনেক গুরুতর রোগেরও একটা লক্ষণ, এক্ষেত্রে রোগিনীকে তিনদিন পরেই আর একবার দেখাতে আসতে বলা হয় যাতে ডাক্তার প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যবস্থা বা পরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন। ভালো থাকলে আবার সাতদিন ও চোদ্দদিন পর আসতে বলা হয়। লক্ষণ না কমলে বা প্রথম থেকেই শুধু জননতন্ত্র সংক্রমণ ছাড়া অন্যকোনো রোগের সম্ভাবনা বুঝলে সত্বর উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাঁচ. যৌনাঙ্গে ক্ষত— সিফিলিস, স্যাংক্রয়েড ও জেনিটাল (Genital Ulcer) হারপিসে যৌনাঙ্গে ক্ষত দেখা যায়। প্রথমে রোগের ইতিহাস জানতে হবে। যদি দেখা যায় বার বার ব্যথাযুক্ত ছোটছোট ক্ষত বা ফোস্কা হচ্ছে তাহলে কিট-৫ দিয়ে যৌনাঙ্গে হারপিসের চিকিৎসা করা হয়। অন্যথা কিট-৩ অথবা কিট-৪ দিয়ে (সিফিলিস ও স্যাংক্রয়েডের) চিকিৎসা করা হয়। সাতদিনের মধ্যে না সারলে উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ছয়. কুচকির (Inguinal Bubo)— রোগের ইতিহাস নেওয়া হয় ও পরীক্ষা করা হয়। যদি কুচকিতে গ্ল্যান্ড ফোলার সঙ্গে যৌনাঙ্গে ক্ষত থাকে তাহলে কিট-৩, কিট-৪ বা কিট-৫ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অন্যথায় কিট-৭ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। লিম্ফোগ্রাণুলোমা ভেনেরিয়াম ও গ্রাণুলোমা ইঙ্গুইনালি রোগে কুচকিতে গ্ল্যান্ড অথবা গ্ল্যান্ডের মত ফোলা দেখা যায়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রেই অ্যাজিথ্রোমাইসিনের বদলে উপযুক্ত ডোজে এরিথ্রোমাইসিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

সংলক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসার সুবিধা

রোগ ও রোগনির্ণয়ের প্রাথমিক স্তরে এই সহজ ছক করে পদ্ধতিতে চিকিৎসা দ্বারা যদি যৌন ও জননতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে শুধু এইসব রোগই যে ভালো হবে তাই নয়— সমাজে এইড্‌স রোগও অনেক কম ছড়াবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যৌন ও জননতন্ত্রের সংক্রমণ আটকালে এইচ আই ভি সংক্রমণ ছড়ানো শতকরা চল্লিশভাগ কমানো যাবে। সরকারি STI/RTI ক্লিনিককে এখন বলা হয় ‘‘সুরক্ষা ক্লিনিক’’— যাতে এখানে দেখাতে আসা রোগীদের গায়ে অনর্থক ‘যৌনরোগী’র তকমা না পড়ে। ক্রমশই মানুষ বেশি সচেতন হয়ে উঠছেন— প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সমাজের ১০০ ভাগ মানুষের কাছেই সঠিকভাবে খবর পৌঁছায়। সুরক্ষা ক্লিনিকে রোগী দেখা ও ওষুধ দেওয়া ছাড়াও রোগীকে আলাদা ঘরে গোপনীতা রক্ষা করে কাউন্সিলিং করা হয়। এজন্য প্রত্যেক সুরক্ষা ক্লিনিকে ডাক্তার নার্স ছাড়া একজন কাউন্সেলরও থাকেন যিনি খোলামেলা কথাবার্তার মাধ্যমে প্রত্যেক রোগীর সমস্যাকে আলাদা ভাবে গুরুত্ব দিয়ে তা বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টা করেন, রোগী বা রোগিনীর সঙ্গীর রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার পরামর্শ দেন, কন্ডোমের ব্যবহার শেখান ও সাপ্লাই করেন। সুরক্ষা ক্লিনিকে সবকিছু সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে করা হয়, এমনকি অনেক সহযোগী সংস্থার কর্মীর মাধ্যমে রোগীকে সঙ্গে করে ক্লিনিকে নিয়ে আসাও হয়। শুধু রোগ হলে চিকিৎসাকেন্দ্রে ওই ঘরটি পর্যন্ত রোগীর পৌঁছানোর অপেক্ষা!

হ্যাঁ, সরকারি ব্যবস্থায় এতোকিছু! তবে সমস্যা তো কিছু আছেই। বেশি রোগী, তুলনায় স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের অপ্রতুলতা। গাফিলতিও যে কোথাও নেই হলফ করে বলতে পারব না। তবে মনে হয় ইতিবাচক দিকটাই বেশি।

লেখক পরিচিতি ঃ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এম বি বি এস, ডি ভি ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

With Best Compliments from :

IPCA / BIONOVA

63-E, Kandivli Industrial Estate,
Kandivli (West)
Mumbai - 400067

মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও নাগরিক স্বাস্থ্য

আমরা সাধারণত ধরেই নিই গ্রামের চাইতে শহরে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভালো—এতো হাসপাতাল, এতো বড় বড় ডাক্তার, এত মন্ত্রী-সান্ত্রীর সদাসতর্ক নজর, তার ওপরে মিডিয়ার দৃষ্টি—ভালো না হয়ে যাবে কোথায়? কিন্তু জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য উন্নতি-অবনতির সূচকগুলোর দিকে তাকালে আমরা ঠিক উল্টো দৃশ্যটাই দেখতে পাব। একদিকে অপরিকল্পিত অবাস্তব প্রচেষ্টা, ফাঁকিবাজি, লোভ, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি আর অন্যদিকে কোনরকম সুনির্দিষ্ট নজরদারি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব নাগরিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের ক্রমাগত অবক্ষয় ঘটিয়ে চলেছে— লিখছেন **ডা. অনিরুদ্ধ কর।**

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠকদের গত সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৩) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ স্বাস্থ্যের হাল-হকিকৎ সম্পর্কে খানিকটা অবগত করার প্রচেষ্টা করেছি। এবারের বিষয় হল মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা ও নাগরিক স্বাস্থ্য। মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা ও মধ্যস্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থাটা হল মূলত রোগ প্রতিরোধ—সেটাতে উপযুক্ত খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা, শৌচালয়ের ব্যবস্থা, গণটিকাকরণ এগুলোই প্রথম কাজ। তবে তার সঙ্গে থাকে প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসাব্যবস্থা, যাতে অন্তত সাধারণ রোগগুলো—যেগুলো চিকিৎসকেরা তুলনায় সহজে চিনতে পারেন ও কম খরচায় চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে পারেন সেগুলোর চিকিৎসা করা। সেটার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা পরিকাঠামো রয়েছে— আমার লেখার প্রথম অংশে সে বিষয়ে লিখেছি। এইবার যে সব রোগীকে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যথাযথ পরিষেবা দেওয়া গেল না, উচ্চতর পরিষেবা পাবার দরকার, তাদের কথা ভেবে মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি হবার কথা। কিন্তু ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসার সব কেন্দ্রগুলোই যেহেতু শহরে বা নগরে অবস্থিত, তাই মধ্যমবর্গীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো আলোচনাই নাগরিক স্বাস্থ্য বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই আলোচনার স্বার্থে দুটি বিষয়কে পাঠকদের সামনে একসাথে উপস্থাপিত করছি।

পশ্চিমবাংলার ব্লক স্তরে তাও একটি চলনসই পরিকাঠামো আছে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য। যদিও তা অপ্রতুল, কিন্তু সাধ্যমত পরিষেবা দেওয়ার একটা লক্ষ্য আছে ও জনগণের আস্থাও অনেকটাই আছে। না হলে এই রাজ্যের জন্মহার, মৃত্যুহার থেকে মহামারী নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবস্থান থাকত না।

মধ্যস্তরের পরিষেবা : কিন্তু মধ্যমবর্গীয় বা Secondary Tier অর্থাৎ জেলা বা মহকুমা শহরে এবং পৌর অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য আছে মহকুমা হাসপাতাল, রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও কয়েকটি বিশেষ হাসপাতাল। এর সঙ্গে যুক্ত হবে পৌর হাসপাতালগুলো। এই রাজ্যের দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, ফলে জনসংখ্যার এক গরিষ্ঠ অংশ বাস করেন পৌর এলাকায়। এবং পৌর এলাকার স্বাস্থ্যরক্ষার দায় বিধিবদ্ধ ভাবে পৌরসভার। এজন্য নির্বাচিত পৌর-প্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাস্থ্য কমিটি আছে এবং তার একজন নেতা হিসাবে Chairman in council আছেন। কলকাতা সহ কর্পোরেশনগুলিতেও অনুরূপ Mayor-in-Council আছেন। তবে ব্লকে যেমন ৫০০০ জন পিছু একটি উপকেন্দ্র আছে যেখানে জনস্বাস্থ্যের সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যায় ও প্রাথমিক

অসুস্থতার চিকিৎসাও সম্ভব —শহরগুলিতে তা নেই। কোথাও কোথাও Kolkata Metropolitan Development Authority-র অর্থানুকুল্যে গঠিত জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিন্তু তা মাসিক সীমাবদ্ধ আয়ের মানুষের জন্য—সর্বসাধারণের জন্য উপলব্ধ নয়। ফলে এই বিশাল জন-অধ্যুষিত অঞ্চল প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। কোথাও কোন অঘটন মানে জ্বরের প্রকোপ বা আন্ত্রিক হলে জেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌরসভার সাহায্য নিয়ে তা মোকাবিলা করে। অর্থাৎ নিবারণমূলক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী বা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু করা প্রায় হয় না। তাই এখানে ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গুর আক্রমণ হলে গণমাধ্যম ছুটে আসেন—রাজনৈতিক চাপান উতোর শুরু হয় এবং উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। বিগত কয়েক বৎসর ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা আন্ত্রিক রোগের রাজ্যগত প্রকাশিত পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে যে শহরতলির গরীব মানুষেরা গ্রামীণ পরিষেবার তুল্য ব্যবস্থার সুযোগ পান না। যদিও শহরের বস্তি ও ঘনবসতি দরিদ্র অঞ্চল গ্রামের থেকেও বেশি খারাপ অবস্থায় আছে---অপুষ্টি, অশিক্ষা ও পরিষেবার অভাবজনিত কারণে। সরকার Urban NRHM বলেছেন বটে কিন্তু কার্যত কিছু হয় নি। এবং এর ফলে যখন মহামারীর আশংকা দেখা দেয় তখন শহরগুলিই বেশি চিন্তার কারণ হয়, কেননা একে পরিকাঠামোর একান্ত অভাব, তার উপর ঘনবসতি ও ক্রমাগত যাতায়াত। কিন্তু এ নিয়ে কারো হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। শহরে এমন অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে রাজনীতির লোকেরা সদা ব্যস্ত। তাই স্বাস্থ্য বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য, অতি উপেক্ষিত একটি বিষয়। তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যই সংগৃহীত নেই।

এখনই যা করা যায়

অবিলম্বে শহরাঞ্চলেও স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপন করা উচিত যা দশহাজার থেকে কুড়িহাজার মানুষকে প্রাথমিক পরিষেবা দিতে পারবে। বর্তমানে এখানে চিকিৎসকরা মূলত স্থানীয় জেনারেল প্র্যাকটিশনার—এঁরা জনস্বাস্থ্যের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে একান্ত উদাসীন। এই ব্যাপারে চিকিৎসকদের সংগঠন যা যা আছে তারাও তেমন উদ্যোগী নয়। ফলে এখানে যক্ষ্মারোগী পয়সা খরচ করে বিধিবর্হির্ভূতভাবে পরীক্ষা করাতে বাধ্য হন চিকিৎসকের উপদেশেই এবং যক্ষ্মা থেকে কুষ্ঠ সব ওষুধই কিনে খেতে হয়। ফলে রোগীরা অনিয়মিত ওষুধ খান ও রোগটিকে আরো দুরারোগ্য স্তরে নিয়ে যান। বিনা খরচে পরীক্ষা ও বিনা পয়সায় সরকারী প্রকল্পের ওষুধ এঁরা অবশ্যই পেতে পারেন। তবে তা করতে গেলে স্থানীয় চিকিৎসকদের ও পৌরসভাগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। দুঃখের কথা বহু চেষ্টা করেও তা করা যায়নি। অথচ দিল্লী শহর,

বেঙ্গালুরু, মুম্বাই এই বিষয়গুলিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। সেখানে চিকিৎসক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিয়েছেন— চিত্রটা ভিন্ন মাত্রার।

এই পরিষেবা প্রদান করার জন্য অর্থের অভাব নেই। প্রতি বৎসর একটি পরিকল্পনা তৈরী করে এগিয়ে গেলে এটা করা যায়। প্রতি বৎসর পরিকল্পনা তৈরী হয়, কিছু অর্থের জোগান আসে, কিন্তু রাজ্যের নাগরিক স্বাস্থ্যের হাল তেমন উন্নত হয় না। গরীব বস্তিবাসী বা দিনমজুরেরা পরিষেবা পান না। আবার রাজনীতির কারণেই পরিষেবার বিন্যাস অসম। কোথাও তা দরকার নেই কিন্তু ঘরবাড়ী পরিকাঠামো বানানো হয়েছে, অথচ যেখানে দরকার সেখানে তা নেই। এই অসম উন্নয়ন চিত্র এই রাজ্যে এত প্রকট যে কেউ এ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই তা চোখে পড়বে।

শহরাঞ্চলে পরিষেবা—একটি উদাহরণ

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জেলার এক কোটির বেশি মানুষকে পরিষেবা দিতে হয়, যার মধ্যে ২২টা ব্লক ও ২৭টা পৌর অঞ্চল ও একটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আছে। জেলার ৪৩-৪৪ % মানুষ শহরে বাস করেন যেখানে সরকারী স্বাস্থ্য-আধিকারিকদের কোন ক্ষমতা নেই, কারণ তা পৌরসভা পরিচালিত। পৌরসভাগুলির জনস্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্যোগের অভাব আছে, পরিকাঠামোরও অভাব আছে। সমস্যায় পড়লে জেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থার দ্বারস্থ হন এবং কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলে। কলিকাতা মহানগর নিগমের অন্তর্গত যতগুলি ওয়ার্ড আছে তার প্রতিটাতে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, চিকিৎসক নেই—বিশেষ করে পরে সংযুক্ত অঞ্চলগুলিতে। ফলে যে কোনো রোগের সংক্রমণ ঘটলে প্রচুর হৈ চৈ হয় কিন্তু পরিষেবার মান বা গুণমান তেমন বাড়ে না। মেডিক্যাল কলেজগুলি শহরে অবস্থিত হলেও শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তাদের কোন আইনত দায় নেই, দায়িত্বও নেই। সেখানে অনেক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আছেন কিন্তু তাঁরা এসবে থাকেন না—কারণ এমন কোন উদ্যোগ বা সরকারী বিধি নেই। ফলে শহরে মায় এই খোদ কোলকাতায় জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে 'দমকল সার্ভিস' চলে মানে আগুন লাগলে জল দাও। বৃহত্তর কোলকাতার হাল আরো খারাপ।

নার্সিংহোম বা কর্পোরেট হাসপাতাল জনস্বাস্থ্যের কোন দায়ভার নেন না। সেখানে যাঁরা চিকিৎসক আছেন তাঁরা জাতীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্প সম্বন্ধে অল্প জানেন, মানেন না অধিকাংশই—এসব দেখার কেউ নেই। কারণ আগেই বলেছি সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ শহরাঞ্চলে অচল পয়সার মতো। মাঝে মাঝে সরকারী নির্দেশনামা জারী হয়—তবে তা কে মানছে আর কে মানছে না দেখার লোক কই? আর গণমাধ্যমগুলিও তাজা খবরে উৎসাহী। তারাও এই বিষয়গুলি তুলে ধরে জনমত গঠন সচেতনতা বৃদ্ধি—এসব কাজে আগ্রহী নয়। এগুলোতো 'Breaking News' নয়।

সামগ্রিক ভাবে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নত করতে হলে নাগরিক জনস্বাস্থ্য নিয়ে অনেক বেশি ভাবতে হবে। পরিকাঠামো অনেকটাই তৈরী করতে হবে, না হলে শহরের গরীব বস্তিবাসীর স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সুনিশ্চিত হবে না। যাঁরা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কিছু না কিছু পরিষেবার ব্যবস্থা নেবেন, কিন্তু যাঁরা দিনমজুরী করেন, বস্তিতে থাকেন, ফুটপাথে বাস করেন বা স্টেশন চত্বরে থাকেন তাঁদের কি হবে? রাষ্ট্রীয় বিমা প্রকল্পগুলি, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও সকল রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন—এঁদের একত্রিত করে নাগরিক জনস্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উদ্যোগী হওয়া আশু প্রয়োজন। এবং এর জন্য সারা রাজ্যে একটা ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। স্বাস্থ্য প্রশাসনেও অনেক বেশি সমন্বয় আনতে হবে, সক্রিয় হতে হবে এবং কিছুক্ষেত্রে বিধি সংশোধন করে নাগরিক জনস্বাস্থ্যকে জেলার জনস্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করতে হবে। তাই মাননীয় বিধায়কদের এই বিষয়ে ভাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম।

বিশেষজ্ঞ পরিষেবা

এরপরে আসা যাক চিকিৎসার কথায়। এখানে যেসব হাসপাতাল আছে তাতে বিশেষজ্ঞ পরিষেবা থাকায় গ্রাম থেকেও মানুষজন এখানে সরাসরি চলে আসেন। কিছু রোগীকে অবশ্য গ্রামের হাসপাতাল থেকেই উন্নত পরিষেবা পাবার লক্ষ্যে মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে রেফার করে পাঠানো হয়।

এই মহকুমা হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালগুলির শয্যাসংখ্যা জনসংখ্যার আনুপাতিক নয়। স্বাস্থ্যদপ্তর একসময় বলেছিল মহকুমা হাসপাতাল সর্বোচ্চ ২৫০ শয্যার ও জেলা হাসপাতাল ৫০০ শয্যার হবে। কিন্তু মহকুমা হাসপাতাল ৭৫-১৫০ শয্যার ও জেলা হাসপাতাল ৩০০-৪০০ শয্যার অবস্থানেই আছে। পরিষেবা বৃদ্ধি হয়েছে কোথাও কোথাও যেমন SNCU (অসুস্থ ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য), ITU (ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট) বা মানসিক বিভাগ, Burn ward ইত্যাদিতে। কিন্তু শয্যা সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি, লোকজনও তেমন বাড়েনি। ১৯৯১ সালের প্রশাসনিক তালিকা নিয়ে ২০১২ তে পরিষেবা দেওয়া যে কতো কঠিন তা এই হাসপাতালগুলিতে

গেলেই বোঝা যায়। একটা উদাহরণ দিই—মহকুমা হাসপাতালে ২ জন Anaesthesiologist বা অজ্ঞান করার ডাক্তারবাবু থাকবেন। এঁদের ৭x২৪ ঘন্টা কাজ করতে হবে। অথচ মেডিক্যাল কলেজের যে কোন OT Table-এ গড়ে ৫ জন থাকবেন। তা হলে গুণমান বা পরিষেবার মান কি করে এক রাখা যাবে? অথচ আমাদের সকলের ইচ্ছা যে জেলা বা মহকুমা থেকে যেন রোগীকে মেডিকাল কলেজে অকারণে না পাঠান হয়। সংখ্যাটাও তো একটা বড় কারণ হতে পারে—পারে না? এর উপর হঠাৎ হঠাৎ করে ঘটা দুর্ঘটনা এই কাজের চাপকে আরো তীব্র করে দেয়। তবুও VVIP visit হলে এঁদের মধ্যে থেকেই লোক দিতে হবে। এবং তাঁরা একটি Ambulance-এর মধ্যে অনেক দূরে রবাহুতের মতো বসে থাকবেন। যদি তাঁদের মধ্যে মহিলাও থাকেন তাঁর জন্য কোন শৌচালয় ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকবে না।

এর পরে তো আছে প্রাইভেট প্র্যাকটিস। যেহেতু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সবাই প্র্যাকটিস করবেন বলে লিখে জানিয়েছেন ও স্বাস্থ্য দপ্তর তাতে সম্মতি দিয়েছে—ব্যাস! চালাও পানসি বেলঘরিয়া! এঁদের বাসস্থানের সামনে জমা ভীড় সকাল থেকে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত। সেখানে রোগী দেখছেন, তার সঙ্গে জেলা বা মহকুমা হাসপাতালের ভীড় ঠাসা আউটডোর করছেন, অপারেশন করছেন—সত্যি! এ এক বিচিত্র জগৎ। এ বৎসরের এক জনপ্রিয় শারদীয়া পত্রিকায় এঁদের জীবন নিয়ে একজন সুন্দর একটি উপন্যাস লিখেছেন—পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু যদি এঁদের বলা যায়—অনেক তো পরিশ্রম করছেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অন্যত্র বদলীর আবেদন করুন—তবে? গোটা রাজ্যে হৈ চৈ পড়ে যাবে—১০-১৫ বৎসর একই জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে কাজ করছেন তাঁকে অন্য কোথাও বদলী করলেই ডেপুটেশন, ফোন, কখনও বা গণমাধ্যমে প্রচার। না গত ৩০ বৎসরে ৩ বারও করা যায়নি। তেমন যে চেষ্টা হয়েছে তাও নয়। বরং চেষ্টার সূত্রপাত হলেই সেই ফাইল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে ৫১ বৎসরের বেশি বয়সী একজন চিকিৎসক ২৪ ঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রম করবেন—যার ফলে চিকিৎসার গুণমান ঠিক নাও থাকতে পারে—তা মেনে নেওয়া যায় না।

আবার ঠিক বিপরীত চিত্র GDMO বা অবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে। মহকুমা বা জেলা হাসপাতালে এঁরা আউটডোর, এমার্জেন্সী সামলান এবং কেউ সপ্তাহে গড়ে ২০-৩০ ঘন্টার বেশি কাজ করেন না। যে ছেলেটি ব্লকে চিকিৎসক হিসাবে সপ্তাহে ৯০-১০০ ঘন্টা কাজ করেছে সেও এই মধ্যমস্তরে একবার আসতে পারলে ঐ ২০-৩০ ঘন্টার দলে নাম লেখাবে। এঁরাই সব চিকিৎসক সংগঠনের হর্তাকর্তা - duty roster নিজেরাই বানান। কোন অধ্যক্ষ বা সুপার যদি না মানতে চান তা হলেই তিনি তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়বেন। ফলত পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি ভর্তি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ পান না - কারণ সেখানে ২৪ ঘন্টা কোন চিকিৎসক থাকেন না। কেন থাকেন না? রেওয়াজ নেই তাই।

পরিষেবা পাবার হয়রানি

জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে রোগী দেখানোর সাধারণ নিয়ম হোল, রোগীকে টিকেট করে সাধারণ বা general outdoor-এ একজন GDMO-কে প্রথম দেখাতে হয়। তিনি কোন specialist বা বিশেষজ্ঞর কাছে পাঠালে আবার সেখানে লাইন দিয়ে দেখাতে হয়।

প্রথমত টিকেট করার জন্য বিশাল লাইন দিতে হয়, কারণ যত মানুষ, কাউন্টার তার চেয়ে অনেক কম। তার উপর সাধারণত চতুর্থ শ্রেণী বা Group D কর্মীরা এই কাজ করেন। টিকেট computer-এ হবার কথা। এর জন্য দেয় অর্থর জন্য আবার একটি লাইন দিয়ে টাকা জমা দিতে হয়। সর্বত্র নয়, অনেক জায়গায়। এসব করে যখন দেখাতে গেলেন, তখন ৪০০-৫০০ লোক এক জায়গায় ভীড় করেছেন। কয়েকজন চিকিৎসক দেখছেন। না, দেখছেন বললে ভুল বলা হয়। দেখা যায় না, সম্ভব নয়। ওঁরা দ্রুত গতিতে ভীড় হাল্কা করছেন। আউটডোর ২-৩ টেতে শেষ হয়ে যায়।

এর পরে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রয়োজন হলে তার কাগজ নেওয়া, টাকা জমা দেওয়া—সারা দিনের কাজ। অথচ বসার ভাল ব্যবস্থা নেই—মাথার উপর পাখা অধিকাংশ জায়গাতেই ঘোরে না। শৌচাগার অপ্রতুল, অপরিচ্ছন্ন, ব্যবহারযোগ্য নয়। সস্তায় খাবার কোন বন্দোবস্ত নেই। ফলে যাঁরা দেখাতে আসেন তাঁরা এবং যাঁরা সঙ্গে এসেছেন সকলেই ক্রমশ ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন, উত্তেজিত থাকেন ও পান থেকে চুন খসলেই শুরু হয় বচসা-গোলমাল।

এর সহজ সমাধান দালাল ধরা। হাসপাতাল কর্মীরা এই দালাল রাজত্বের সঙ্গে কেউ কেউ যুক্ত, অধিকাংশই নন। তাঁরা সৎ এবং এর বিরোধী। কিন্তু হাসপাতালে মাফিয়ারাজ আছে, ফলে দালালরা অবাধে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন, অবশ্য দরে পোষালে। এক শ্রেণীর চিকিৎসকও এর সঙ্গে যুক্ত। এঁরা ভর্তি বা পরীক্ষার দিন পেতে সাহায্য করেন।

বিশেষজ্ঞরা সকালে একপ্রস্থ private practice করে বেলা ১১টা-১২টায় আউটডোরে আসেন ও কয়েকটি বাছা রোগী দেখেন। ‘Catch মারা’ রোগীদের সরাসরি এখানে দেখান হয় ও তাঁরা আগে পরীক্ষার বা ভর্তির সুযোগ পান। রাজনৈতিক দাদা থেকে প্রশাসনিক কর্তা সকলেই সুযোগমতো এই catch বা অনুরোধ সূচক পত্র পাঠান বা ফোনে বলে রাখেন। এর ফলে ভর্তির তালিকায় হযবরল হয়। তা হোক এভাবেই চলছে। দিনের শেষে Regret No Bed Vacant ছাপমারা কাগজ নিয়ে ভর্তির যোগ্য রোগী ফিরে যান। আবার আসেন, আবার ফিরে যান। শেষে ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে ভীড় করেন, না হয় দালাল ধরেন।

এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সবদিন আউটডোর করেন না। কোথাও ঘরের অভাব, কোথাও লোকের অভাব, আবার কোথায় ইচ্ছার অভাব। কোন বাধ্যবাধকতা তো নেই। তখন পরিষেবা বন্ধ থাকে। ভেবে দেখুন পশ্চিমবাংলায় অনেক জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে ডেন্টাল টেকনিশিয়ান আছেন, কিন্তু কোথাও দাঁত বাঁধানো হয়না। কার্যত দাঁত তোলা ও সামান্য কিছু পরিষেবা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। এক আধুনিক দন্ত চিকিৎসা Root Cannal Treatment কিন্তু সরকারী হাসপাতালে হয় না। যেমন Minimal Invasive Surgery বা Laparoscopy—এটা কোন জেলা বা মহকুমার হাসপাতালে করার জন্য ব্যবস্থা নেই। কোন জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে প্রস্টেট অপারেশন হয় না। ক্যান্সার সার্জারি খুব কম হয়। কয়েকটি ক্লিনিক চেষ্টা করেও চালু করা যায়নি। যেমন ডায়াবেটিস ক্লিনিক বা গ্লুকোমা ক্লিনিক। কিন্তু এইসব রোগ ভয়ানক বাড়ছে।

উন্নত পরিষেবা ও পরিকল্পনার গলদ

অথচ হাসপাতালের বাইরে নার্সিংহোমে এ সবই হয়। একই শহর, একই ডাক্তার বাবু—সুতরাং হাসপাতালে হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই সমীকরণ আমি বুঝতে পারি না। যেমন পারি না বুঝতে যে, এই শ্রেণীর হাসপাতালে কোথাও বায়োপ্সি বা কালচার হয় না অথচ বাইরের ল্যাবোরেটরিতে হয়। এটা সবাই জানেন বিশ্বব্যাঙ্কের ধারের টাকায় অর্থাৎ জনগণের টাকায় SHSDP-II নামক অদ্ভুত এক প্রকল্পে জেলা মহকুমা হাসপাতালগুলিতে উন্নত পরিষেবা দেবার লক্ষ্য ছিল। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল। কিন্তু পরিষেবা বাড়ল কোথায়? প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন DM, ADM, CMOH (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার মুখ্য মেডিকেল অফিসার) বা এ ধরনের কেউ, বিশ্বের নানা জায়গায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এর জন্য প্রশিক্ষণে পাঠানো হল না। ফলে জেলা বা মহকুমার প্রয়োজন ও লভ্য পরিষেবা অপ্রতুলতার সুযোগে বাড়ছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও রোগী বা আত্মীয়স্বজনের ক্ষোভ। গত ৩০-৩৫ বৎসরে এটা বেড়েই গেছে। এর মৌলিক পরিবর্তনের উদ্যোগ চোখে পড়েনি, এর মধ্যেই যুক্ত হয়েছে ITU বা Burn Ward তৈরীর উদ্যোগ বা SNCU। এগুলি সব বিশেষ ধরনের উন্নত পরিষেবার জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন যন্ত্রপাতি, দেখভালের অভাব সর্বত্রই।

যন্ত্র খারাপ হলে সারানো খুব সমস্যা কারণ ঐ ঠিকাদার নির্ভরতা। এত বড়ো স্বাস্থ্য দপ্তরে গাড়ির জন্য বিভাগ আছে, কিন্তু যন্ত্রপাতি সারাবার কোন বায়ো-ইক্যুইপমেন্ট বিভাগ নেই।

স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এরপরে বলা যাক রাজ্য সাধারণ হাসপাতালগুলির কথা। পশ্চিমবাংলা ছাড়া ভারতবর্ষে কোথাও স্বাস্থ্যবিভাগ এ ধরনের হাসপাতাল চালায় না। এতে আবার ৬ শয্যা থেকে ৩০০ শয্যা অবধি আছে। কয়েকটিতে কোন বিশেষজ্ঞ পদই নেই। আর যেখানে তা আছে তা এমন অপ্রতুল যে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা পাওয়া যায় না। ভেবে দেখুন গোটা ব্যারাকপুর মহকুমার, যার

জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের বেশি, সেখানে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা মানে মূল বিষয়গুলির বিশেষজ্ঞ পরিষেবা পাওয়া যায় শুধু মহকুমা হাসপাতালে, যার শয্যা সংখ্যা ৪০০-র কম। অথচ এই মহকুমায় ১০০ শয্যার অধিক শয্যাবিশিষ্ট রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল আছে ৬টি, যার মধ্যে একটি বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ৬টি হাসপাতালের এটিকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘন্টার পরিষেবা দেবার কথা রাজ্যের তদানীন্তন Health Subject Committee বলেছেন। জেলা ও রাজ্য স্বাস্থ্যপ্রশাসন অনেক মিটিং আলাপ আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও চিকিৎসকদের এক শ্রেণীর অসহযোগিতার জন্য এই হাসপাতালগুলি স্বল্প ব্যবহৃত, অথচ এখানেও বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মী আছেন। তাঁদের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। যেভাবে সরকার অবিনাশ দত্ত, ইন্দিরা বা লেডী ডাফরিন হাসপাতালের সংযোগকরণের মাধ্যমে শয্যা সদ্ব্যবহার করছেন সম্প্রতি, সেভাবেই এদের কথাও ভাবা যায় না? না হলে আর জি কর বা এন.আর.এস. হাসপাতালের ভীড় কমবে কি করে? কল্যাণীতে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ চালু হল, কিন্তু পরিষেবার মান ও সংখ্যা বাড়ল কতখানি, যদি ৬০-৭০ এর দশকের জহরলাল হাসপাতালের পরিষেবার সঙ্গে তুলনা করা যায়?

ফলত নাগরিক চিকিৎসাব্যবস্থা ও জন স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই দুই-এর-ই যথাযথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা অতি প্রয়োজন। প্রয়োজন শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির ও তার সঙ্গে যথাযথ যন্ত্রপাতি ও কর্মচারী বৃদ্ধির। না হলে হাসপাতাল নিয়ে অসন্তোষ সহজে কমবে না। এবং বারে বারে জনরোষ আছড়ে পড়বে।

বিশেষ পরিষেবা ও হাসপাতালগুলির প্রশাসনিক সংযুক্তি

মধ্যমস্তর বা এই দ্বিতীয়স্তরের চিকিৎসাব্যবস্থা ও নাগরিক জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা দুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এখানে ঘনবসতি আছে, গণমাধ্যম সহজেই পৌঁছতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি বিক্ষোভ দানা বাঁধে। তাই এই স্তরের পরিষেবার পরিকাঠামো ও গঠনগত মান দুটিকেই অনেকটা উন্নত করতে হবে।

জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে Minimal Invasive Surgery (MIS) Package অর্থাৎ কম কাটাকুটি করে অপারেশন করার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা উচিৎ। এর চাহিদা আছে এবং হাসপাতালে কম দিন থাকতে হয়, ফলে শয্যার ব্যবহার বাড়ানো যায়। আর কোলকাতা শহরে কোন একটিকে যেমন পিজি পলিক্লিনিক, রামরিকদাস হাসপাতাল, বিজয়গড় হাসপাতালে যেখানে পরিকাঠামো আছে—পুরোপুরি MIS হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং এই পরিষেবা প্যাকেজের মূল্য বাজারের থেকে কম করতে হবে আর এর একটা নির্দিষ্ট অংশ চিকিৎসক সহ পুরো 'MIS team' কে দিতে হবে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। এটা করলে বাজারে এই অপারেশনের দাম কমবে যেমন হয়েছে ল্যাবরেটরী পরীক্ষা বা সি.টি. স্ক্যান-এর ক্ষেত্রে।

জেলা বা মহকুমা হাসপাতালে বায়োপ্সি ও কালচার চালু করতে হলে ডিপ্লোমা ইন ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি (DCP) আবার চালু করতে হবে। এটা অনায়াসে আই পি জি এম ই আর ও ট্রপিক্যাল মেডিসিনকে নিয়ে করা যায়। এতে যাঁরা পাশ করে বেরোবেন তাঁরা জেলা বা মহকুমা-পরিষেবার বিস্তার ঘটাতে পারবেন। সহজেই এটা করা যায়। কেন যে তুলে দেওয়া হোল এবং কেনই বা চালু করা যাচ্ছে না এর সঠিক জবাব কেউ দিতে পারবেন না।

কল্যাণী গান্ধী হাসপাতালটি ধুঁকছে অথচ ওটা আমাদের গর্বের জায়গা ছিল এক সময়। ঐ হাসপাতালটির নবরূপায়ন করা দরকার কারণ রোগীর চাপ বাড়ছে।

কেন্দ্রের টাকায় পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ের ধারে আধুনিক Trauma Care (আঘাতের চিকিৎসা) হাসপাতাল হবার প্রকল্প ছিল। খড়গপুরে তার প্রথমটা চালু হবার কথা। কলকাতা পুলিশ Trauma Ambulance চালু করেছেন, ওঁদের ভবানীপুর পুলিশ হাসপাতালে Trauma Care Centre হবার কথা। এগুলি খুব জরুরী এবং এই উদ্যোগ রূপায়িত হলে অনেক প্রাণ বাঁচবে, অনেক জীবন পঙ্গুত্বের থেকে মুক্তি পাবে। এর সাথে 'সিভিল ডিফেন্স'-এর মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল কেয়ার' এবং 'ফার্স্টএইড'-এর একটা ভালো ট্রেনিং সাধারণের জন্য দরকার। ক্রিটিক্যাল কেয়ার (Critical Care)-এর একটি ডাক্তারদের ডিপ্লোমা কোর্স অবশ্যই চালু হওয়া উচিৎ। না হলে ২০১৩ সালের পরে এই সমস্যা আরো জটিল হতেই থাকবে আগেই উল্লেসিত হয়েছে।

আমরা চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার কথা ভাবি, কিন্তু নার্স ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফ তাঁদেরও তো উন্নয়ন দরকার। মানসিক হাসপাতালগুলি চলছে মানসিক চিকিৎসা-সেবার নির্দিষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্স ছাড়াই। ITU বা Dialysis clinic চলছে—প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের খুব অভাব। সরকারী হাসপাতালে সন্তানহীনতার আধুনিক চিকিৎসা হয় না। এমনকি কোন মেডিক্যাল কলেজে এই চিকিৎসার আধুনিক ব্যবস্থা নেই। টেস্ট টিউব বেবি বা 'Surrogacy' এখন বহুল প্রচলিত এবং সবই প্রাইভেট ক্লিনিকে মহার্ঘ্য। কেন সরকারী পরিষেবা থাকবে না?

আর একটি অবহেলিত দিক হল ফিজিওথেরাপি—স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ও তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। নীলরতন সরকার হাসপাতালে অর্থোপেটিক্স পড়ান হোত, পাশ করে ছেলেমেয়েরা বসে আছে, কিন্তু জেলা বা মহকুমা হাসপাতাল এমন কি মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও অরথোপটিক্স-এর কোন পরিষেবা নেই। দুর্ঘটনা বাড়ছে, হাড়ের অপারেশন বাড়ছে কিন্তু পরিষেবা সম্পূর্ণ না থাকলে রোগীর জীবনের গুণগতমান অনেক কমে যায়। আমরা কি তাই চাই? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়েই পরিষেবার একটি ভাল দল হয়। এই ভাবনাটাই এখানে অনুপস্থিত। কোন অ্যাম্বুল্যান্স ড্রাইভারের ফার্স্ট এইড প্রশিক্ষণ নেই অথচ St. Johns এর ভাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। জেলা-শাসকরা এই সংস্থায় পদাধিকারবলে যুক্ত, যেমন যুক্ত জেলার মুখ্য মেডিক্যাল অফিসারও।

আসলে এই স্তরের বিষয়টি নিয়ে একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা ও গ্রামীণ পরিকাঠামোর মতো একটি জনসংখ্যাভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈয়ারি করা আশু দরকার। অনেকটাই আছে কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট রূপরেখা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচালনব্যবস্থার মধ্যে না নিয়ে এলে জনগণের ক্ষোভ কমবে না এবং আমরাও অনেক অকালমৃত্যুকে আটকাতে পারবো না।

লেখক পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ কর, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ সহ বিভিনজন প্রশাসনিক পদেও কাজ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা—পরিচিতি, ব্যবহার ও অপব্যবহার

বেশ কয়েক বছর হল দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের জন্য ভারত সরকার একটি সরকারি স্বাস্থ্য বিমা চালু করেছেন। সরকার সেই বিমার 'প্রিমিয়াম' দিয়ে দেন, ও গরীব মানুষ বিনামূল্যে অনেক চিকিৎসা সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানেই পেতে পারেন। সেই 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'-র নানা দিক নিয়ে লিখছেন **বাবু সাহা**।

- **রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য যোজনা জিনিসটা কী? কাদের জন্য?**

এটা হল গরীব মানুষদের জন্য করা একটা স্বাস্থ্য বিমা। সাধারণত বিমা করলে যিনি বিমা করেন, অর্থাৎ বিমাকারীকে, কিছু টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে দিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার বিমার জন্য বিমাকারীকে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে কোনও টাকা দিতে হয় না। সরকার সেই টাকাটা দিয়ে দেন। বিমাকারীকে একটা কার্ড করাতে হয়। একে বলে স্মার্ট কার্ড, কেননা সেই কার্ডে তথ্য সঞ্চিত থাকে। কারা পরিবারের সদস্য, ওই বছরে কতটা টাকা চিকিৎসার জন্য পরিবার ব্যয় করেছেন আর কতটা টাকা তাঁরা আরও ব্যয় করতে পারেন—এই সবই ওই স্মার্ট কার্ড থেকে উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

- **মানুষ কিভাবে স্মার্ট কার্ড করাতে পারেন?**

সরকার এই কার্ড করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে ক্যাম্প করার বন্দোবস্ত করেন। দারিদ্র-সীমার নিচে থাকা সমস্ত পরিবারকে আগে থেকে করা তালিকার সাহায্যে চিহ্নিত করা থাকে - তাঁদের সবাইকে পঞ্চায়েত অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড করার শিবিরে ডাকা হয়। সেখানে বিমাকারীকে পরিবার-পিছু এককালীন ত্রিশ টাকা দিয়ে কার্ড করাতে হয়। একটি কার্ডে এক পরিবারের পাঁচজন পর্যন্ত বিমার আওতায় আসতে পারেন। কোনও পরিবারে পাঁচজনের বেশি সদস্য থাকলেও কিন্তু পাঁচজনের বেশি বিমার সুবিধা পাবেন না। কোন পাঁচজন পাবেন সেটা পরিবারের প্রধান ঠিক করে দেন।

- **একটা স্মার্টকার্ডে কটা ফটো থাকে?**

একটিই ফটো থাকে----সেটি পরিবারের প্রধানের। বাকিদের ফটো তোলা হয়, এবং সরকারি কমপিউটারে সেটি থাকে, যাতে প্রয়োজন হলে বা বিতর্ক হলে দেখা যায় যে অন্যদের সবাই সত্যিই পরিবারের সদস্য কিনা। ফটো ছাড়াও থাকে সবার আঙুলের ছাপ - তারও কাজ ওই একই।

- **স্মার্টকার্ড করার শিবির অনুষ্ঠিত হবার কতদিনের মধ্যে পরিবারটি স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ পেতে পারেন?**

আগে ফটো তোলার শিবির হবার পরে স্মার্ট কার্ড হাতে পেতে কয়েক মাস লেগে যেত। এখন ফটো তোলার দিনই ওই শিবির থেকেই স্মার্টকার্ড হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ পেতে তারপর কয়েকদিনের অপেক্ষা।

- **রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার স্বাস্থ্য বিমার সাহায্যে কী কী চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়?**

যেখানেই হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার স্বাস্থ্য বীমার সাহায্যে চিকিৎসার সুযোগ আছে। হাসপাতাল সরকারি হোক আর বেসরকারি, বা হোক নার্সিং হোম, সবক্ষেত্রেই একই সুযোগ। শুধু বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের ক্ষেত্রে তাদের নামটা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার খাতায় নথিভুক্ত থাকতে হবে। যেহেতু বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমগুলো সরকার থেকেই পয়সা পেয়ে যায়, এবং সেই পয়সাটা খুব কম কিছু নয়, তাই আজকাল একদম ঝাঁ-চকচকে শহুরে বড়লোকদের বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ছাড়া অধিকাংশ নার্সিংহোম / বেসরকারি হাসপাতাল রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার খাতায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার চেষ্টা করছে। ফলে বহু জায়গায় এই বিমার সুবিধা মিলছে।

- **যে সব ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে বিমাকারী কী পাবেন?**

অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন না হলেও বিমাকারী সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন। একে পরিভাষায় বলা হয় 'ডে-কেয়ার সার্জারি'। যেমন ধরুন ছানি কাটার অপারেশন করে ডাক্তারবাবু রোগীকে একদিন ভর্তি রাখতে না-ও পারেন। সকালে অপারেশন করে সন্ধ্যেয় ছেড়ে দিতে পারেন। তবু রোগী কিন্তু বিমার পুরো সুবিধা পাবেন। এরকম কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্র আছে; তাদের সবগুলোতে যে সার্জারি বা অপারেশন লাগে তা কিন্তু নয়। যেমন কিডনির রোগীর জন্য ডায়ালিসিস। এইসব কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের একটি তালিকা আছে। এর বাইরে অন্য চিকিৎসার জন্য যদি রোগী হাসপাতালে ভর্তি না হন তো তাঁকে বিমার সুবিধা দেওয়া যাবে না, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা চালাতে হবে।

- **হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে আউটডোর চিকিৎসা বা ডাক্তারের দক্ষিণা ও ওষুধের খরচ কি তাহলে এই বিমা থেকে পাওয়া যাবে না?**

সাধারণভাবে বলতে গেলে, না, পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেখানেও বিশেষ পরিস্থিতিতে এই খরচ পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতাল ভর্তি হবার আগে ভর্তি হবার জন্য কিছু পরীক্ষা করতে হলে বা কিছু ওষুধ খেতে হলে হাসপাতাল সেই বিমাকারীকে সেসব বিনাপয়সায় করিয়ে দিতে পারে - কিন্তু প্রমাণ রাখতে হবে, দেখাতে হবে যে তিনি যথাযথ ডাক্তারি পরামর্শক্রমে হাসপাতালে ভর্তি হবার আগের ধাপ হিসেবেই ওই পরীক্ষাগুলি

করিয়েছিলেন, এবং পরে নিয়মমাফিক ভর্তিও হয়েছিলেন। আর হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময় হাসপাতালটি রোগীকে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য পাঁচদিনের ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে দেবে - সেটার খরচও হাসপাতাল বিমার টাকা থেকেই পেয়ে যাবে।

● **'প্যাকেজ চার্জ'—ব্যাপারটা কী?**

'প্যাকেজ চার্জ' ব্যাপারটা হল এই যে কিছু বিশেষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে (ধরুন পিত্তপাথুরির জন্য পিত্তথলি কেটে বাদ দেবার অপারেশন) সব কিছু হাসপাতাল নিখরচায় করে দেবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভর্তি হবার আগের ওষুধ, অপারেশন, ভর্তি থাকাকালীন শয্যা, নার্সিং, চিকিৎসা, ওষুধ, খাবার ও ছেড়ে দেবার পরে দরকারি ওষুধ ও ডাক্তারের কাছে ফলো-আপ—এই সব মিলিয়ে একটা থোক টাকা ধরা থাকে। পুরোটাই হাসপাতাল করে দেবে ও রোগীর কাছ থেকে এক পয়সাও নেবে না—পরে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কাছ থেকে পুরোটাই পেয়ে যাবে। 'প্যাকেজ চার্জ'-এর লিস্টে নেই, কিন্তু প্যাকেজে আসতে পারে, এমন কিছু কিছু চিকিৎসাতেও হয়তো হাসপাতাল আগেভাগে অনুমতি নিয়ে রোগীকে 'প্যাকেজ চার্জ' এর সুবিধা দিতে পারে।

অপারেশন	খরচ (টাকায়)
ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেকটমি	১০,০০০
একদিকের ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া	১০,৫০০
অ্যাবডোমিনাল হিস্টেরেকটমি	১০,০০০
একদিকের হাইড্রোসিল	৩,৭৫০
দুদিকের হাইড্রোসিল	৫,০০০

● **হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে গিয়ে রোগী কার সঙ্গে কথা বলে এইসব সুবিধা সম্পর্কে জানবেন?**

যেসব হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা আছে সেখানকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট কাউন্টার রাখা। সেখানে এইসব সুবিধা কিভাবে পাওয়া যায় সে ব্যাপারে রোগীকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। এমনকি যদি সেখানকার স্মার্ট কার্ড মেশিনটি কোনও কারণে কাজ না করে, সেই অজুহাতে রোগীকে ফেরানো বা টাকা চাওয়া চলবে না, হাসপাতালের দায়িত্ব হল যেভাবে হোক এই কার্ডটির ব্যবহার করা। রোগীর দায়িত্ব কেবল যথাযথ কার্ডটি সঙ্গে নিয়ে পৌঁছানো। পরিবারে নথিভুক্ত যে কোনও সদস্যের আঙ্গুলের ছাপ দিলেই কার্ডটি মেশিনে নথিভুক্ত হবে, কার্ডে কত টাকা আছে জানা যাবে, এবং তত টাকার চিকিৎসা হাসপাতাল বা নার্সিংহোম (ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে) বিনা পয়সায় করাতে বাধ্য। তার চাইতে বেশি টাকা লাগলে সেটা আগেভাগে জানিয়ে রোগীর কাছ থেকেই সেই অতিরিক্ত পয়সাটা নিতে হবে।

● **তার মানে স্মার্টকার্ড থাকলেও হাসপাতালে ভর্তি রোগী পকেট থেকে খরচা করবে?**

ওই যে বলা হল, পরিবার পিছু বছরে সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকা। ধরুন পরিবারে বাবা, মা, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলের হাইড্রোসিল চিকিৎসার জন্য চার হাজার টাকা খরচ হয়েছে, এক মেয়ের পিত্তপাথুরির জন্য দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। মায়ের গর্ভাশয় কেটে বাদ দিতে গেছে চোদ্দহাজার

টাকা। তাহলে মোট আঠাশ হাজার টাকা এক বছরে খরচ হয়েই গেছে। এবার বাবার চোখ অপারেশনের জন্য যদি চার হাজার টাকা লাগে তো রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা স্মার্ট কার্ড থেকে দুহাজার টাকার বেশি দেবে না, বাকি দুহাজার টাকা পকেট থেকে দিতে হবে। কিন্তু এই অপারেশনটা যদি সেই বছরের পরে করা যায় তো কার্ডে আবার ত্রিশ হাজার টাকা জমা করবেন সরকার, এবং বাবার চোখ অপারেশনের জন্য চার হাজার টাকা পুরোটাই সেখান থেকে পাওয়া যাবে। কার্ডের হিসেবে কবে নতুন বছর শুরু হবে সেটা জানতে হবে। সেটা কার্ড দেবার সময়ে বলে দেওয়া হয়, তাছাড়া হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কাউন্টার থেকেও সেটা জেনে নেওয়া যায়।

● **আগে থাকা অসুখের ক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রীয় বিমা যোজনার সুবিধা পাওয়া যাবে?**

সাধারণত স্বাস্থ্য বিমা করার আগে থেকে কোনও অসুখ থাকলে বিমা কোম্পানিগুলো সেই অসুখ বা তার ফলে উদ্ভূত কোনও অসুখের চিকিৎসার জন্য টাকা দেয় না। ধরা যাক কোনও ডায়াবেটিস রোগী সাধারণ কোম্পানির কাছে পয়সা খরচ করে স্বাস্থ্য বিমা করালেন—বিমা কোম্পানি দেখে নিল বিমা করার আগে থাকতেই তাঁর ডায়াবেটিস রোগ আছে। এবার ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে খরচ করলে বিমা কোম্পানি এক পয়সাও দেবে না। শুধু তাই নয়, ধরা যাক তাঁর ডায়াবেটিস-এর ফলে কিডনি নষ্ট হয়ে গেল, ডায়ালিসিস করতে হল। বিমা কোম্পানি ডায়ালিসিস-এর জন্য এক পয়সাও দেবে না। এদিক থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুবিধা অনেক বেশি, কেন না বিমা করার আগে থাকতে কোনও অসুখ থাকলেও সেব্যাপারে চিকিৎসার খরচ এই বিমাতে পাওয়া যাবে। তাই এই বিমা করার সময়ে বিমাকারীর কোনও অসুখ আছে কিনা সেসব পরীক্ষাও করা হয় না।

● **প্রসবকালীন খরচ কি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা থেকে পাওয়া যায়?**

হ্যাঁ। আরও একটা খরচ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা থেকে পাওয়া যায়, যা কিনা আর কোনও বিমায় পাওয়া যায় না। সেটা হল হাসপাতালে ভর্তির জন্য যাতায়াতের খরচ, বা রাহাখরচ। প্রতিবার হাসপাতালে ভর্তির জন্য বিমাকারী যাতায়াতের খরচ হিসাবে ১০০ টাকা পান। তবে একটি বিমা চালু থাকা অবস্থায় বিমাকারী পরিবার সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকার বেশি রাহাখরচ পাবেন না, তারপর হাসপাতালে ভর্তি হলেও নিজের খরচে যেতে-আসতে হবে। এই রাহাখরচ পাবার জন্য কোনও ট্রেন-বাসের টিকিট বা ওইরকম কোনও প্রমাণপত্র দেখাতে হয় না।

এবার আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সম্পর্কে দুচার কথা বলি, আর দেখি তৃণমূল স্তরে এর সুফল পৌঁছেছে কিনা। আমরা এর জন্য নদীয়া জেলার একটি অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরব, কিন্তু মনে রাখব যে ব্যাপারটা সবজায়গায় একরকম ভাবে হচ্ছে না; আবার এই অভিজ্ঞতা অন্তত আংশিকভাবে অন্য জেলা বা গ্রামেও সত্য হবার বাস্তব সম্ভাবনাও আমরা উড়িয়ে দেব না।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY) অন্য অনেক রাজ্যে আগেই চালু হয়ে গেছে, তবে আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ জায়গায় এটা ২০১০ সালের আগে চালু হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতে এর কাজ চলছে। স্বাস্থ্য বিমা, স্বাস্থ্য-পরিষেবা,

স্বাস্থ্য-সুরক্ষা এই উদ্দেশ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামের সব মানুষ এর আওতাভুক্ত। পরিবার-পিছু এককালীন ত্রিশ টাকা দিয়ে এই যোজনার আওতায় এলে এক বছরে প্রতিটি পরিবারের সর্বাধিক পাঁচজন সদস্য ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে।

- **একশ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্প ও রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-র সুযোগ**

২০১২ সাল থেকে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটি প্রকল্প এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট তথা MGNREGA-এর একশ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্পে বেশিদিন কাজ করেছেন (১৫ দিন বা তার বেশি) যিনি তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কারণ হল, একশ দিনের কাজের প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার আরও জনপ্রিয় করতে চাইছেন। কিন্তু এঁদের যে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-তে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারটা গ্রামের গরীব মানুষেরা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি, ফলে এই সুযোগে গ্রামের করিতকর্মা মাতব্বরেরা বেশ কিছু বাবুলোকের নামও এই নিখরচার স্বাস্থ্য বিমাতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মাতব্বরেরা অন্যায়ভাবে এইসব বাবুলোকের একশ দিনের কাজের প্রকল্পের জব কার্ড করিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর সেগুলো বাৎসরিক আর্থিক চুক্তিতে ভাড়া নেন, আর গ্রামের সব কাজের প্রকল্পেই এঁদের কার্ডগুলো ব্যবহার করেন। ফলে রেকর্ড অনুযায়ী এই কার্ডগুলোর মালিকরা বছরে ১৫ দিনের বেশি MGNREGA-তে কাজ করেছেন। যদিও এঁরা সত্যিকারের কাজ কিছু করেন নি, ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে চাপ দিয়ে কম কাজকে বেশি কাজ বলে জবরদস্তি করে দেখিয়ে সরকারের MGNREGA-র টাকা মেরে দিয়েছেন। কিন্তু খাতায়-কলমে তাঁরা ১৫ দিনের বেশি কাজ করেছেন বলে দেখানো আছে, ফলে তাঁরাই আবার নিখরচায় স্বাস্থ্য বিমার অধিকারী হয়ে যান। নেপো শুধু দই মারার চেষ্টা করেছিল, ফাউ হিসেবে যে সন্দেশটাও পেয়ে যাবে সেটা সে তখন ভাবেনি, পেয়ে গিয়ে এরাই দিব্যি সব সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে, কেন না এরাই গ্রামীণ সমাজের কেষ্টা-বিষ্টু।

- **রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা-র কার্ড ও তার সুবিধাভোগীদের নানা অভিজ্ঞতা**

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্পের জন্য প্রত্যেক প্রাপকের নামে ছাপানো স্লিপ আসে ও সেগুলো তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন তাঁরা পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে যেখানে এজেন্সিটি ক্যাম্প করেছে সেখানে এসে ফটো তোলার জন্য লাইন দেন। সকালের দিকে তুলনায় ফাঁকা থাকে, কেননা গ্রামের মানুষ তখন রুজি-রোজগারের ধান্দায় ক্ষেতে খামারে। এখানে প্রথমে ত্রিশ টাকা দিয়ে রসিদ নেওয়া, তারপর ঘরের মধ্যে ক্যামেরার সামনে পরিবারের পাঁচজনের বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া। গ্রাম-পঞ্চায়েতের একজন কর্মচারী তাঁর বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে পরিবারটিকে সনাক্ত করতে সাহায্য করেন। ব্যাস— সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের কর্তার হাতে কার্ডটি তুলে দেওয়া হয়। কার্ডে পরিবার-প্রধানের মুখের ছবি ও নাম থাকে। বিগত বছরগুলোতে কিন্তু কার্ড পরে দেওয়া হতো। অনেক সময় ফটো তোলার পর কার্ড মিলতে বছর গড়িয়ে যেত। তাই এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে। যেমন পাট ছাড়ানোর সময়ে মানুষ সকালে আসতে পারেন না, বেলা তিনটের পর থেকে ভিড় জমান, আর রাত্রি আটটা পর্যন্ত কাজ করেও শেষ করা যায় না।

কার্ড করতে আসা পরিবারগুলোর কথা থেকে জানা যায়, গত বছর কোনও পরিবার অপারেশন করিয়েছে, টাকা লাগেনি। কেউ হয়তো এসেছেন - কার্ড করানোর পরে তবে তাঁর বাবার চোখের ছানি কাটাতে পারবেন। কিন্তু ছুবান ভাই, পানসুন্দুরী বেওয়ারা অন্য কথা বলেন। কার্ড করে তাঁরা পরিবারের মানুষকে তালিকাভুক্ত নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়েছেন, অপারেশন হয়েছে। তারপর ছুটির সময়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কার্ডটি নিয়ে দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলেছেন—আঙুলের ছাপ মিলছে না, জাল কার্ড? নাকি আঙুলের ছাপটা ভালো করে নেয় নি? যাহোক, তাঁদের তো টাকাটা দিতে হবে। তখন তাঁরা ধার-কর্জ করে টাকা দিয়ে এসেছেন। আসলে নার্সিংহোম কার্ড নিয়ে টাকা বের করে নিল, আর নিরক্ষর মানুষগুলোর কাছ থেকেও টাকা নিল—তাঁরা বুঝতেই পারলেন না।

গত বছর কোনও পরিবার অপারেশন করিয়েছে, টাকা লাগেনি। কেউ হয়তো এসেছেন—কার্ড করানোর পরে তবে তাঁর বাবার চোখের ছানি কাটাতে পারবেন।

- **রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা—সব ঠিক হ্যায়?**

MGNREGA-তে গ্রামের মাতব্বরেরা অন্যায়ভাবে নানা বাবুলোকের একশ দিনের কাজের প্রকল্পের 'জবকার্ড' করিয়ে দেন, তারপর সেগুলো বাৎসরিক আর্থিক চুক্তিতে ভাড়া নিয়ে গ্রামের সব কাজের প্রকল্পেই এঁদের কার্ডগুলো ব্যবহার করেন, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনাতেও সেরকম দুর্নীতি ঘটছে। সরকারের টাকা মারা যাচ্ছে, গরীবের কার্ড হচ্ছে না, হলেও অনেক নার্সিং হোম টাকা লুটেপুটে খাচ্ছে। এটা একটা চিন্তার বিষয়। বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার কাউন্টারে কিভাবে কত টাকা নেওয়া হল সেটা সরল গরীব গ্রামীণ মানুষ, যাঁদের অনেকে আবার নিরক্ষর, তাঁরা ধরতেই পারেন না। ভয় হয়, জ্বরের জন্য ভর্তি রোগীর কার্ড থেকে অপারেশন হয়েছে দেখিয়ে মোটা টাকা কেটে নেবে নাতো চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের দল? আরও ভয়ের কথা, টাকার লোভে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অতিরিক্ত ও অনর্থক অপারেশন করার চক্র শুরু হয়ে যাচ্ছে না তো গ্রামে-গঞ্জে? এতদিন বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নার্সিং হোম এই গরীবদের তেমন পাত্তা দেয়নি, কেননা এঁরা প্রকৃত দরকার থাকলেও ভর্তি হবার বা অপারেশন করার টাকা যোগাড় করতে পারতেন না। এবার স্মার্টকার্ড তাঁদের বাণিজ্যিক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা তাঁদের সামাজিক অবস্থানের তো আর বড় পরিবর্তন করতে পারেনি, তাঁদের নিজেদের অধিকার, কার্ড ব্যবহারের নিয়মকানুন বিষয়ে সচেতনও করতে পারেনি। সুতরাং কথা হল, সরকারের এই উদ্যোগ আপাতদৃষ্টিতে ভালো, কিন্তু সঠিক রূপায়নের অভাবে বিফলে যাবে নাতো? আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঘরপোড়া গরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরাই। মানুষ হুঁশিয়ার না হলে গরীবের স্বাস্থ্য বিমা-র সুফল কে লুটে নেবে কে জানে!

গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য সরকার সব খরচ করছে, কিন্তু সেটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় নয়, বেসরকারি হাসপাতাল - নার্সিংহোমে।

শেষে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এর উত্তর আমার জানা নেই, তাই পাঠকদের দরবারে প্রশ্নটা পেশ করি। গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য সরকার সব

> *সরকারই যখন সব টাকা খরচ করছে, তখন সরকার নিজের ব্যবস্থাপনায় সরকারি হাসপাতালের উন্নতি ঘটাচ্ছে না কেন, যাতে সেখানেই উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়, রোগীকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় যেতে হয় না?*

খরচ করছে, কিন্তু সেটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় নয়, বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিংহোমে। তাহলে টাকার অভাবে সরকার 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে এগোতে পারছেন না, এটা তো বলা যায় না। সরকারই যখন সব টাকা খরচ করছে, তখন সরকার নিজের ব্যবস্থাপনায় সরকারি হাসপাতালের উন্নতি ঘটাচ্ছে না কেন, যাতে সেখানেই উন্নত পরিষেবা দেওয়া যায়, রোগীকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় যেতে হয় না? উলটে সরকার সরকারি হাসপাতালে যেটুকু ফ্রি ছিল সেসব বন্ধ করে দিচ্ছে, সেখানে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের নাম করে সব লাভ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, এমনকি গোটা হাসপাতালটাই দিয়ে দিচ্ছে - তার জাজ্বল্যমান (আক্ষরিক অর্থেই) উদাহরণ হল ঢাকুরিয়ার সরকারি 'নিরাময়'-কে জতুগৃহ 'আমরি'-তে পরিণত করা। সরকার নিজে তার হাসপাতালের উন্নতি ঘটাচ্ছে না কেন? একই ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী তো বেসরকারি-সরকারি দুরকম হাসপাতালেই আছেন—কী সেই কারণ যার ফলে সরকার নিজেই মনে করছেন যে কেবল বেসরকারি ব্যবস্থায় 'সব ঠিক হ্যায়' আর সরকারি ব্যবস্থাটা উদ্ধার করার চেষ্টাও অসমীচীন? অথচ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা আর তার স্মার্টকার্ড শুরু হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই আমরা দেখছি বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চিকিৎসাক্ষেত্রের স্বাস্থ্যোদ্ধারের চাইতে অর্থোপার্জনে অধিক দক্ষতা দেখাতে ব্যস্ত।

প্রিয় পাঠক, এ-ধাঁধার জবাব জানা থাকলে এই অধম লেখককে জানিয়ে বাধিত করবেন।

লেখক পরিচিত : বাবু সাহা পশ্চিমবঙ্গের একটি পঞ্চায়েত-এর সরকারি কর্মী। 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'-র কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

মেনোপজ এবং কিছু সমস্যা

‘মেনোপজ’ তথা বরাবরের জন্য মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু জীবনের ওই পর্যায়ে কিছু অবাঞ্ছিত সমস্যা আসে কেন, আর সেগুলি কতটা গুরুতর, তার জন্য কী কী করা দরকার—আলোচনা করেছেন

ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস।

বেশ কয়েকবছর আগে ট্রেনে ভ্রমণের সময় একজন পশুচিকিৎসকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একটু মজা করেই জানতে চেয়েছিলাম পশুদের মেনোপজের সমস্যা কিরকম। বেমক্কা প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন; আমি তাঁকে হেসে বললাম, “আপনার এটা না জানারই কথা, কারণ সমস্যাটা একমাত্র মনুষ্য প্রজাতির।” পৃথিবীর অন্য কোন প্রজাতির স্ত্রী-সদস্যরা এটা অনুভব করে না। যদিও বয়সের সাথে সাথে তাদের প্রজননক্ষমতা কমে যায়, কিন্তু তারা আমৃত্যু প্রজননশীল থাকে।

এ প্রসঙ্গে ঋতুচক্র (menstrual cycle) **নিয়ে কিছু কথা বলি।**

মেয়েদের ঋতুস্রাব (menstruation) শুরু হওয়াকে Menarchae বা ঋতুমতী হওয়া বা রজোদর্শন বলে। আমাদের দেশে এটা ১১-১২ বছর বয়সে শুরু হয়। মেনোপজ কথাটা গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। Menos অর্থাৎ মাস, আর Pausis অর্থাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া। আমাদের এই উপমহাদেশে মহিলাদের ৪৯-৫০ বছর বয়সে যদি কমপক্ষে এক বছর সময় ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে তবে আমরা অবস্থাটাকে মেনোপজ (Menopause) বা ঋতু-সমাপ্তি বলি। মেনোপজ শব্দটার একটা সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা চালু আছে, রজোনিবৃত্তি। বাংলা শব্দটা যাই বলি না কেন, কথাটার মানে এক—মেয়েদের ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ব্যাপারটা আবহমানকাল ধরে ঘটে এসেছে, কিন্তু বর্তমানে এই সমস্যা নিয়ে এত আলোচনা কেন? বর্তমানকালে পৃথিবীতে ৩০ শতাংশ মহিলা ৫০ বছর বা তার বেশী বয়সের। ভাল খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা সব মিলিয়ে মানুষের গড় বেঁচে থাকার বয়স এখন প্রায় ৭০-৭২ বছর। ফলে মেনোপজ সম্পর্কিত সমস্যা এবং তার প্রতিকার বার্ধক্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Geriatric medicine) অন্যতম বিষয়, এবং বার্ধক্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া, আগে মেয়েদের যৌনতন্ত্র বা জননতন্ত্র নিয়ে কথা বলাই হতো না, ওটা একটা ‘ট্যাবু’ বা ভদ্র আলোচনার পক্ষে অযোগ্য খারাপ বিষয় ছিল। এখন সেই মনোভাব অনেকটা কেটেছে।

মেনোপজ (Menopause) **বা ঋতু-সমাপ্তি কেন হয়?**

শুরু থাকলে তার শেষও থাকবে। এটা দেখা গেছে যে একটি মেয়ে তার জন্মের সময় প্রায় এক মিলিয়ন (অর্থাৎ দশ লক্ষ) অপরিপক্ক ডিম্বাণু (oocytes) নিয়ে জন্মায়। এরপর প্রতি মাসে কয়েক হাজার অপরিপক্ক ডিম্বাণু পরিণত হবার চেষ্টা করে এবং নিঃশেষিত হতে থাকে। এর ফলে দেখা যায় যে যখন কোন মহিলা তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছান তখন তাঁর ডিম্বাশয়ে মাত্র কয়েক হাজার ডিম্বাণু অবশিষ্ট থাকে। ক্রমশঃ কয়েক বছরে সমস্ত ডিম্বাণু নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মহিলার ঋতুস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমরা বলি যে মহিলার মেনোপজ বা ঋতুসমাপ্তি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিম্বাণুর কাজ কি? প্রতি মাসে যখন অপরিপক্ক ডিম্বাণুগুলি পরিপক্ক হয় তখন ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন (oestrogen) এবং প্রজেস্টেরন (progesterone) নামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী-হরমোন নিঃসৃত হয়। এই ইস্ট্রোজেন হরমোন একটি বাচ্চা মেয়ের ১০-১২ বছর বয়সে স্তন তৈরী, যৌনকেশ তৈরী এবং ঋতুস্রাব শুরু করে; আমরা এই অবস্থাটাকে বয়ঃসন্ধি (puberty) বলি। এই সমস্ত যৌনলক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে একই সময়ে মেয়েটির মা হবার ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতাও প্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রতি মাসে ঋতুস্রাব চলতে থাকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তার পরে ডিম্বাণু সংখ্যা কমে যাওয়ায় মাসিক যেমন অনিয়মিত হতে থাকে, মহিলার প্রজনন ক্ষমতাও দ্রুত হ্রাস পায়।

যে ‘ম্যাজিক হরমোন’ মহিলাদের ঋতুবতী করতে, তার সমস্ত যৌন অঙ্গ পুষ্ট করতে এবং প্রজনন ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে অংশ নেয় তা হল মূলত ইস্ট্রোজেন, এবং তার সাথে সঙ্গী থাকে প্রজেস্টেরন। ইস্ট্রোজেন হরমোন মূলতঃ ডিম্বাশয় থেকে তৈরী হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সংখ্যা যখন একটা যুগসন্ধি পর্যায়ে (critical period) পৌঁছায়, তখন এই ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণও দেহে কমতে থাকে। মেনোপজ বা ঋতুসমাপ্তির প্রায় পুরো সমস্যাটাই এই ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাবের জন্য।

ইস্ট্রোজেন হরমোনের আরো দুটো উৎস আছে: (১) অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, (২) পেরিফেরাল টিস্যু বা দূরবর্তী কলা (চর্বি তথা Adipose tissue)। কিন্তু মেনোপজের পর প্রজেস্টেরন সম্পূর্ণ ভাবেই হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে মেনোপজ শুরু হওয়ার চার বছর আগে থেকে—যে সময়টাকে পরিবর্তন-কালীন দশা (Transition phase) বলা হয়—ঋতুস্রাবে কিছু অস্বাভাবিক দেখা যায়; যেমন ঋতুস্রাব বেশী হয়, অনেকদিন ধরে ঋতুস্রাব চলতে থাকে, ঋতুচক্র অনিয়মিত হয়ে যায়, অথবা মাসিকের মাঝখানে রক্তস্রাব হতে পারে।

কৃত্রিম মেনোপজ (Artifical Menopause) এর সবথেকে সহজপ্রাপ্য উদাহরণ হল সার্জিক্যাল মেনোপজ (Surgical Menopause)। হঠাৎ কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে থাকলে (জরায়ুর টিউমার ইত্যাদি) জরায়ু ও ডিম্বাশয় কেটে বাদ দেওয়া হয়। তখন এই অবস্থাটাকে সার্জিক্যাল মেনোপজ বলে। যেহেতু এটা আকস্মিক, তাই দেহ মেনোপজের সমস্যার মোকাবিলার (acclimatization-এর) সময় পায় না। এজন্য মেনোপজের তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলি এদের বেশী হয়।

মেনোপজের সমস্যা : তাৎক্ষণিক (Immediate) সমস্যা

❖ Hot flush—দেহে আগুনের ছটার মতো লাগা;

❖ Sweating —প্রচণ্ড ঘেমে যাওয়া;

আগেই বলেছি ইস্ট্রোজেন ডিম্বাশয় ছাড়াও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি এবং চর্বি থেকে তৈরী হয়। এজন্য স্থূলকায় মহিলারা ওপরের এই সমস্যাগুলিতে কম ভোগেন, তাঁদের অতিরিক্ত চর্বির জন্য। এছাড়াও স্থূলকায় মহিলাদের মেনোপজ একটু দেরীতে হয়। তাছাড়াও যে তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে তা হল:

❖ ঘুমের সমস্যা (Insomnia),
❖ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাপ্রবণতা (Anxiety),
❖ খিটখিটে মেজাজ (Irritability),
❖ আলস্য বা শ্রান্ত লাগা (Tiredness),
❖ মেজাজ ও মানসিকতার পরিবর্তন (Mood disturbance),
❖ যৌন ইচ্ছে কমে যাওয়া (Loss of sexuality & libido)

ওপরের সবগুলোই মেনোপজের তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলির অন্যতম, যদিও এগুলো অনেকটাই মনস্তত্ত্ব-ঘটিত (Psychosomatic)। এটা দেখা গেছে যে, পশ্চিম এশিয়ার মহিলাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলো কম, কারণ মেনোপজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বোরখা পড়ার কড়াকড়ি বন্ধ হয়। ফলে মেনোপজকে তাঁরা কিছু অর্জন করা (achievement) মনে করেন।

মধ্যকালীন (Intermediate) সমস্যা :

ইস্ট্রোজেনের অভাবে দেহে দ্রুত কোলাজেন (collagen) নামক এক যোগকলা ও স্নেহ পদার্থ কমতে থাকে। ফলে দেহের অনেক অঙ্গই শুকোতে থাকে বা ছোট হয়ে যেতে থাকে; বিশেষত; যোনি (vagina), মূত্রাশয় (urinary bladder) এবং মূত্রনালী (urethra)—এদের ভিতরের কোষ-আবরণী (epithelium) পাতলা হয়ে যায় এবং শুকিয়ে যায়। এসব অঙ্গের ভিতরের মাংসের স্তর (muscle layer) কোলাজেন ও / বা স্নেহ পদার্থের অভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে বয়স্ক মহিলারা প্রস্রাবে জ্বালা, বারবার প্রস্রাব পাওয়া এবং প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখতে না পারার সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া যৌনসংসর্গের সময় ব্যথা অথবা রক্তপাত হতে পারে। একই ভাবে এই কোলাজেন কমে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন অস্থিসন্ধি, বিশেষ করে কোমরের অস্থিসন্ধি (hip-joint) এবং পেশীতে যন্ত্রণা অনুভব হয়।

দীর্ঘকালীন (Long term) সমস্যা :

হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া (osteoporosis), হৃদযন্ত্রের সমস্যা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পাওয়া দীর্ঘকালীন সমস্যাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। ডিম্বাশয়ের থেকে নিঃসৃত হরমোনগুলি হাড়ের ঘনত্ব এবং রক্তরসে ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষা করে। দেখা যায় যে, ৭০ বছর বয়সে মহিলারা তাঁদের দেহের হাড়ের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ ঘনত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং এঁদের হাড় ভাঙ্গার প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে যায়।

ইস্ট্রোজেন হৃদযন্ত্রের রোগ (cardiovascular disease)-কে অনেকাংশে প্রতিরোধ করে। রক্তে বিভিন্ন প্রকার কোলেস্টেরলের তুলনামূলক মাত্রা বজায় রাখে। ইস্ট্রোজেন রক্তের ভাল কোলেস্টেরল (HDL)-এর মাত্রা বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল

(LDL)-এর মাত্রা কম করে এবং এর মাধ্যমে হৃদযন্ত্রকে এবং বিভিন্ন ধমনীকে রক্ষা করে।

প্রতিকার :

যে সমস্ত মহিলারা মেনোপজের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন তাঁদের চিকিৎসা শুরুর প্রথমে পূর্ণাঙ্গ দেহের পরীক্ষা, স্তন পরীক্ষা, জরায়ু-মুখের কোষ এবং জরায়ু-মুখ নিঃসৃত তরল পদার্থের পরীক্ষা (cervical cytology), ওজন পরীক্ষা, রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাপ ইত্যাদি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নেওয়া দরকার। তাছাড়াও তাঁদের সম্পূর্ণ ঋতুচক্রের ইতিহাসও (menstrual history) ঠিকভাবে নেওয়ার পর চিকিৎসাপ্রণালী ঠিক করা হয়।

চিকিৎসাপ্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হল—

❖ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তন (Life Style Modifications)
❖ দেহের তাপমাত্রা কম রাখা
❖ দেহের ওজন একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা
❖ ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করা
❖ প্রাণায়াম (aerobic respiratory exercise) ইত্যাদি।
❖ Hormone Replacement Therapy (হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি)

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) বলতে বোঝায় বাইরে থেকে দেহে হরমোনের যোগান দেওয়া। মেনোপজের সমস্যাগুলিকে প্রতিরোধ করতে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা প্রণালী। মুখ্য হরমোন যেটা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় তা হল ইস্ট্রোজেন। এটা মূলত কার্যকরী সেইসব মহিলাদের জন্য যাঁদের জরায়ু অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব মহিলার জরায়ু বর্তমান আছে তাঁদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করলে সেটা জরায়ুর কোষ বৃদ্ধি (uterine hyperplasia) করে, এমনকি জরায়ুর ক্যান্সারের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয়। তাই এইসব মহিলাদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেনের সাথে মাসের শেষ ১২-১৪ দিন প্রজেস্টিন হরমোন ব্যবহার করলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলিকে প্রতিরোধ করা যায়।

ইস্ট্রোজেন হরমোনের যেসব রূপভেদগুলি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল কনজুগেটেড ইস্ট্রোজেন (conjugated oestrogen) এবং মাইক্রোনাইজড ইস্ট্রাডিওল (micronised oestradiol)। আর প্রোজেস্টিন হরমোনের যেসব রূপভেদগুলি হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল মেড্রোক্সিপ্রোজেস্টেরন অ্যাসিটেট (medroxyprogesterone acetate), মাইক্রোনাইজড প্রজেস্টেরন (micronised progesterone) এবং ডাইড্রোজেস্টেরন (Dydrogesterone)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টিন হর্মোনের ব্যবহার চালু। তাদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ এরকম :

Oral oestrogen regimen— জরায়ুবিহীন মহিলাদের দৈনিক ০.৬২৫ মিগ্রা বা ১.২৫ মিগ্রা মাত্রায় কনজুগেটেড ইকুইন ইস্ট্রোজেন দেওয়া হয়।

Oestrogen জরায়ু আছে যেসব মহিলা, তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের প্রথম ২৫ দিন ইস্ট্রোজেন এবং মাসের শেষ ১২-১৪ দিন এর সাথে প্রজেস্টিন যোগ করা হয়।

Continuous oestrogen + progestin therapy— প্রতিদিন ইস্ট্রোজেন + প্রোজেস্টিন থেরাপি জরায়ুর কোষবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুস্রাব দেখা যায়।

ইস্ট্রোজেন ট্যাবলেট ছাড়াও চামড়ার নীচে subdermal implants, transdermal patch

হিসাবে, চামড়ার ওপর জেল (percutaneous oestrogen gel) হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তাছাড়াও যেসব মহিলাদের যোনিদ্বার শুষ্ক হয়ে সমস্যা দেখা যায় (Atrophic vaginitis), তাদের ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাল জেল (vaginal gel) হিসাবেও ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

প্রোজেস্টিন — যেসব মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বা জরায়ুর ক্যান্সারের ইতিহাস আছে তাঁদের ক্ষেত্রে প্রোজেস্টিন ব্যবহার করা হয়।

টিবোলোন ও ইস্ট্রাডিয়ল হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির ওষুধ। এ দুটি স্টেরয়েড ওষুধ। এদের মধ্যে একই সাথে কিছু ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের গুণাবলী আছে। এদুটি হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া (osteoporosis), vaginal atrophy, hot flush কমাতে সাহায্য করে।

মেনোপজ সম্পর্কিত সমস্যার জন্য হরমোন ব্যতীত অন্য যে ওষুধ ব্যবহার করা হয়—

- ক্লোনিডিন
- SSRI গ্রুপের কিছু ওষুধ, যেমন পারক্সিটেন, ফ্লুওক্সিটিন
- SNRI গ্রুপের কিছু ওষুধ - ভেনলাফেক্সিন
- ডোপামিন অ্যান্টাগনিস্ট- ভেরালিপ্রাইড
- গাবাপেন্টিন
- মেরটাজাপিন
- ট্রাজোডোন

তাছাড়াও খাবারে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম সয়াবিন খেলে মেনোপজ সমস্যাগুলি অনেকাংশ কম হয়।

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ব্যবহার করা যায় না যেসব ক্ষেত্রে

- লিভার সম্পর্কিত সমস্যা অনির্ণীত
- অনিয়মিত এবং ঋতুস্রাব (undiagnosed vaginal bleedings)
- রক্ত অতিরিক্ত জমাট বাধার রোগ (thromboembolic events)
- জরায়ুর ক্যান্সার
- স্তনের ক্যান্সার

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সমস্যা

দীর্ঘকালীন ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করলে জরায়ুর কোষবৃদ্ধি এবং জরায়ুর ক্যান্সার, স্তনের ক্যান্সার, গল ব্লাডারের রোগ বাড়ার প্রবণতা ও রক্ত জমাট বাধার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রজেস্টেরন রক্তের ভাল কোলেস্টেরল (HDL)-এর মাত্রা কম করে এবং খারাপ কোলেস্টেরল (LDL)-এর মাত্রা বাড়ায়।

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়?

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি শুরু করার পর মহিলাদের নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা করা দরকার, যেমন রক্তচাপের পরিমাপ, ওজন, স্তন পরীক্ষা, cervical cytology, তলপেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি) ইত্যাদি। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপী শুরু করার পর মহিলাদের এর সুবিধা এবং অসুবিধা সম্বন্ধে ভালোভাবে কাউন্সেলিং করা হয়। যদি কোন মহিলা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি শুরু করার পর নিয়মিত তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করান তাহলেই এই থেরাপির সুবিধা অনুযায়ী দীর্ঘকালীন চিকিৎসা হিসেবে এটি ব্যবহার করা যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস, এমবিবিএস, এমডি, একটি কেন্দ্রীয় সরকারী হাসপাতালে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিরোগ বিভাগে ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

Space donated by :

A WELL WISHER

দিল এক মন্দির : মেলোড্রামার খপ্পরে ডাক্তারবাবু

অংশুমান ভৌমিক

ইয়াদ না জায়ে বিতে দিনো কি
যাকে না আয়ে জো দিন
দিল কিঁউ বুলায়ে
উনহে দিল কিঁউ বুলায়ে?

মুখরাটুকু পড়তে পড়তে গুনগুনিয়ে উঠছেন তো? বাহবা। ঠিক এমনটিই চেয়েছিলাম। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। হঠাৎ ভেসে আসা পুরোনো জমানার হিন্দি সিনেমার গান ওই পুরোনো চালের ভাতের মতো। স্বপ্নসুরভি মাখা। মহম্মদ রফির ফ্যান হলে তো কথাই নেই, না হলেও সেই কবেকার সেই বিনাকা গীতমালা থেকে শুরু করে আজকের এফএম রেডিও বা এম পি থ্রি ফরম্যাটের 'সেন্টিমেন্টাল হিটস' বা 'স্যাড সংস' গতের সংকলনে এই গানটির অবাধ গতিবিধি। দেখতে দেখতে পাঁচ দশক পার হয়ে গেল। ঢিমে লয়ের ওয়েস্টার্ন অর্কেস্ট্রেশন সহযোগে গাওয়া এই বিষাদসংগীতের জুড়ি খুব বেশি নেই। এটি লিখেছিলেন শৈলেন্দ্র, সুর দিয়েছিলেন শঙ্কর জয়কিষেন। কথা আর সুরের এমন হরগৌরী মিলন সে আমলে বছরে দু-তিনটে তো হতই। এটি ওই উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দুতে সেই যে ঠাঁই পেয়েছে, আর ঠাঁইনাড়া হয়নি। অদ্ভুত মাদকতা আছে। একবার কানে বসে গেলে ফেউয়ের মতো লেগে থাকে। তখত-এ-তাউস থেকে নড়ানো যায় না, যতক্ষণ না অন্য কোনও নাছোড়বান্দা গান এসে তার জায়গা নিচ্ছে ততক্ষণ জাগ্রত তন্দ্রায় ঘুরপাক খায়।

গানটি না হয় মনে পড়েছে? সিনেমাটি মনে পড়েছে কি? মহম্মদ রফির এই প্লেব্যাকের মতো সিনেমাটিরও বয়স নয়-নয় করে পঞ্চাশ হয়ে গেল। নামটি মনে করিয়ে দিই— 'দিল এক মন্দির'। এটি ষাটের দশকের অপ্রতিরোধ্য রোম্যান্টিক হিরো রাজেন্দ্রকুমার ওরফে জুবিলি কুমারের জনপ্রিয়তম ছবিগুলির একটি। ষাটের দশকের হিন্দি সিনেমার দেবদাস ছিলেন রাজেন্দ্রকুমার। ত্রিকোণ প্রেমের বিচ্ছেদবিন্দুতে তাঁর অনিবার্য অবস্থান। তাঁর হৃদয়ে ক্রমাগত রক্তক্ষয়। 'দিল এক মন্দির'-এ ত্রিকোণ প্রেমের অন্য দুই বিন্দুর একটিতে রাজকুমার। বিষাদবিধুর রোম্যান্টিক হিরোর আর এক গন্ধর্ব। এই ছবিতে তাঁদের প্রেম যাঁর মুখ চেয়ে ঘুরেফিরে মরে তিনি মীনাকুমারী। বলিউডের ট্র্যাজিক হিরোইনের আদিকল্প।

আমাদের কাছে 'দিল এক মন্দির' প্রণিধানযোগ্য কারণ এই ছবির সাড়ে পনেরো আনাই একটি হাসপাতালের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রকুমার যে ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেটি ডাক্তারবাবু, নাম ধর্মেশ। এই ধর্মেশ এক তরুণ ক্যানসার স্পেশালিস্ট। বিলেতের ডিগ্রিধারী।

রাজকুমার ওরফে রাম তাঁর কাছে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। রামের স্ত্রী সীতার ভূমিকায় আছেন মীনাকুমারী। গুরুতর অসুস্থ স্বামীর আপদে বিপদে অষ্টপ্রহর আছেন তিনি। এই তিনজনকে বাদ দিয়ে আরও কয়েকটি চরিত্র আছে 'দিল এক মন্দির'-এ রিলিফ হিসেবে। আসল গল্পে ঠেকা দেবার কাজে তাদের লাগে। সবটুকু আকর্ষণ থাকে ওই ত্রিকোণ প্রেমের পরিবর্তনশীল ভরকেন্দ্রে।

এটুকু বলে আমরা একটু পিছু ফিরব।

হিন্দিতে তৈরি হলেও 'দিল এক মন্দির' আদতে একটি জনপ্রিয় তামিল ছবির রিমেক। প্রযোজক সংস্থা চিত্রালয়। পরিচালক সি ভি শ্রীধর। এখন বাংলা সিনেমা হোক বা হিন্দি, ষাটের দশক ছিল মেলোড্রামার যুগ। কোনও মহৎ আদর্শ নয়, আম আদমির রোজকার সুখদুঃখ নিয়ে একটির পর একটি আবেগবিহ্বল সিনেমা বানিয়েছে বলিউড। এর একটি ফর্মুলা ছিল পঞ্চাশের দশকের জাঁদরেল প্রযোজক তথা ফিল্মিস্তান স্টুডিওর মালিক শশধর মুখোপাধ্যায়ের বানানো। একে আমরা বম্বে ফর্মুলা বলতে পারি। এই গতের সব রোম্যান্টিক কমেডিতে নাচনা-গানা তো থাকতই, দুষ্টুলোকও থাকত বিলক্ষণ। এই বম্বে ফর্মুলার দৌলতে হিন্দি সিনেমার গল্পের গরু গাছে চড়তে শুরু করে। আবার ওই ষাটের দশকেই বম্বে ফর্মুলাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলে ম্যাড্রাস ফর্মুলা। এই ফর্মুলাতে গল্পের ল্যাজা আর মুড়োর মধ্যে পাকাপোক্ত সম্বন্ধ থাকত। নাটক জমত আবেগকে সম্বল করে। এই মাদ্রাজি স্টুডিওর ফর্মুলাতেই ফ্যামিলি সোশ্যালস ধাঁচের এক ধরনের পারিবারিক ছবি তৈরি হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়ায়। এক সর্বংসহা নারী থাকতেন আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে। তাঁর স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গকে ভিত করে তৈরি হত ছবি। এই ধারার সিনেমা মীনা কুমারীকে ছাড়া ভাবাই যেত না। ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিল এক মন্দির' এই বাজার চলতি ফর্মুলার প্রতিনিধিস্থানীয়।

মনে রাখতে হবে রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার তখন তাঁদের ফিল্মি কেরিয়ারের সেরা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬২ সালে গুরু দত্তের 'সাহেব বিবি অউর গুলাম'-এ ছোটিবহু সেজে সারা জমানা মাত করে দিয়েছেন মীনাকুমারী। সে বছর আরও একটি ছবি 'আরতি'-তে ডাক্তার দিদিমণি সেজেছিলেন মীনাকুমারী। এক ডাক্তারের বাগদত্তা হয়েও সমাজ বদলের স্বপ্নে মাতোয়ারা এক কবির প্রেমে পড়েন আরতি, অর্থাৎ সেই ডাক্তার দিদিমণি। পরিণতি সুখের হয়নি। উভয়সংকটে পড়ে নিজের জীবনের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেন আরতি।

ষাটের দশকে বিভিন্ন পেশার মানুষকে নিয়ে সিনেমা বানিয়েছে বলিউড। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনও-না-কোনও ভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষকে নায়ক হতে দেখেছি অসংখ্যবার। এই ধারার সেরা দৃষ্টান্ত রাজ কাপুরের 'সঙ্গম'। চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে জড়িত মানুষও নায়ক হচ্ছেন, নায়িকা হচ্ছেন। 'আরতি'-র কথা আগেই বলেছি, 'অনুপমা' বা 'খামোশি'-র কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। শেষোক্ত দুটি ছবির সঙ্গে বঙ্গসন্তানরা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 'খামোশি'-র আকর অসিত সেনের 'দীপ জ্বেলে যাই'। সেটি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত ফিরে যাই 'দিল এক মন্দির'-এ।

ডাক্তারি পড়ার সময়ই ধর্মেশের (রাজেন্দ্র কুমার) সঙ্গে মাখোমাখো প্রেম ছিল সীতার (মীনাকুমারী)। উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সব। গাড়ি হাঁকিয়ে হ্রদের ধারে গিয়ে গান গাইতে গাইতে

প্রেমিকার মানভঞ্জন করছেন প্রেমিক, এমন দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু সে সবই ফ্ল্যাশব্যাকে। আসলে ডাক্তারি পাশ করার পর উঁচু কোনও ডিগ্রি হাসিল করতে এক বছরের জন্য বিলেত গিয়েছিলেন ধর্মেশ। কথা ছিল ফিরে এসে বিয়ে করবেন দুজন। নিয়তি বাদ সাধল। সীতার বাবা যে ব্যাঙ্কে উঁচু পদে কাজ করতেন সে ব্যাঙ্কে তহবিল তছরূপ হল। বেকসুর হওয়া সত্ত্বেও দায় পড়ল সীতার ভালোমানুষ বাবার ওপর। এখন উপায়? বাতলে দিলেন ব্যাঙ্কের মালিকপক্ষের একজন। নিজের ছেলে রাম (রাজকুমার)-এর সঙ্গে সীতার বিয়ের সম্বন্ধ করলেন তিনি। শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা হল সীতার। শেষমেশ কুলই রাখলেন তিনি। দেশে ফিরে হতভম্ব হলেও বিবাগী না হয়ে হাসপাতাল করলেন ধর্মেশ। ক্যান্সার চিকিৎসায় বিলিয়ে দিলেন নিজেকে। ছোটো একটি হাসপাতাল, সবেধন নীলমণি একটি অ্যাসিস্টেন্ট, দুয়েকজন নার্স, জনা তিনেক সাপোর্ট স্টাফ আর পরিবারের মতো হয়ে থাকা জনা কয়েক রোগী। এই হাসপাতালে খাস মরিজের জন্য আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, সেখানে দিব্যি পরিপাটি সংসার পাতা যায়, তার অ্যান্টিচেম্বারে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরণকমলাশ্রিত হনুমানের পুজোআচ্চাও চলতে পারে। তবে ধর্মেশের বৃদ্ধা মা (অচলা সচদেব) চেয়েছিলেন ছেলের বিয়ে দিতে। দুয়েকটি সম্বন্ধও এনেছিলেন। কিন্তু সীতাকে ভুলতে পারেনি যে ছেলে সে কী করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে? তিনি মাকে বোঝান, এই হাসপাতালই তাঁর দুলহন, তার সঙ্গেই তিনি সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন, ইতরজনের মতো ইহজীবনে আরও একটি বিবাহের বাসনা তাঁর নেই।

ক্যালেন্ডারে ১০ নভেম্বর। ঘটনাচক্রে ক্যান্সারে আক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে অজান্তে ধর্মেশের চেম্বারে এসে পড়লেন সীতা। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধকালীনও তৎপরতায় চিকিৎসা শুরু করতে হল ধর্মেশকে। একদিকে মরণাপন্ন রামের প্রতি মনোযোগ, অন্যদিকে অধুনা পরস্ত্রী তথা পূর্বপ্রেমিকা সীতার প্রতি অনিবার্য আকর্ষণের টানাপোড়েনে দন্ধাতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। ত্রিকোণ প্রেমের পরতে পরতে বিপন্ন বিস্ময় খেলা চালিয়ে গেল। 'ইয়াদ না জায়ে বিতে দিনো কি' গানটি ওই টানাপোড়েনের সহচর।

'দিল এক মন্দির' যত এগিয়েছে এই টানাপোড়েন তত বেড়েচে। নিজের কৃতকর্মের জন্য যতই আক্ষেপ থাকুক না কেন ধর্মেশের কাছে স্বচ্ছ থাকার জন্য সীতা খুলে বলেছে বাকি ইতিহাস। যে রাম কিছুই জানতেন না, বারেবারে আড়ি পেতে তিনি জেনেছেন সীতার ধর্মসংকটের কথা। রক্তাক্ত হয়েছেন সকলে। সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত হয়েছেন ডাক্তারবাবু। অস্ত্রোপচারের দিন যত এগিয়ে এসেছে তত দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। ব্যক্তি আবেগ-অনুভূতি আগে না কর্তব্য-সংকল্প আগে, এই দুধর্ষ অগ্নিপরীক্ষায় তাঁকে ফেলে দিয়েছেন পরিচালক। শেষে নিজের জীবন দিয়ে আদর্শ চিকিৎসকের কুলধর্ম রক্ষা করেছেন ধর্মেশ।

এ তো গেল গল্পের সারাৎসার। কিন্তু জনপ্রিয় চলচ্চিত্র কীভাবে ডাক্তারবাবুকে আইডলাইজ করছে তার কায়দাকানুন বুঝতে হবে আমাদের।

প্রেমের কাছে ধর্মেশের আনুগত্য আছে। সে প্রেম বিফল হলেও তাঁর আনুগত্যে চিড় ধরেনি। উপরন্তু প্রেমিকার পরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে মানানসই হবার জন্য তাঁর চেষ্টার কসুর নেই।

এ তো গেল ব্যক্তিমানুষটির কথা। তিনি ব্যক্তিমানুষটির সঙ্গে চিকিৎসক মানুষটির পদে পদে সংঘাত হয়েছে 'দিল এক মন্দির'-এ। এমনকী দুরূহ অস্ত্রোপচারের আগে সীতা তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়েছেন যে সীতাকে ফিরে পাবার আশায় বিভোর হয়ে ধর্মেশ যেন কোনও অধর্ম না করে ফেলে। ধর্মেশ বলেন, 'ম্যায় তুমকো বচন দেতা হুঁ কি তুমহারে রাম কো বাঁচানে কে লিয়ে আগর মুঝে মরনা ভি পড়ে তো ম্যায় ঘাবড়াউঙ্গা নেহি।'

২৪ নভেম্বরের অস্ত্রোপচারের জন্য দিন-রাত এক করে প্রস্তুত হয়েছেন তিনি। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখেছেন, মেডিক্যাল জার্নাল থেকে নোট করেছেন। নাওয়া ভুলেছেন, খাওয়া অথৈবচ। মন তো ভেঙেইছিল, অমিতাচারে ভেঙেছে শরীরও। তবু মাঝরাতে বন্ধু ডাক্তারবাবুকে বলেছেন, 'ইয়ে মেরে লিয়ে সির্ফ এক মরিজ কি অপরেশন নেহি, পর এক ডক্তর কি জং হ্যায় মওত কি খিলাফ।'

যুদ্ধে নেমেছেন তিনি। সর্বস্ব পণ করে ছুরি, কাঁচি ধরেছেন। সফল অস্ত্রোপচার করেছেন। রাম বিপন্মুক্ত হয়েছেন।

ওদিকে মেলোড্রামার ক্ল্যাসিক ফর্মুলা মাফিক (ত্রিকোণ প্রেমের একটি বিন্দুকে নিকেশ না করতে পারলে যে অঙ্ক মেলে না) হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়েছেন স্বয়ং ডাক্তারবাবু। বুক চেপে বসে পড়েছেন সিঁড়িতে, কোনও রকম শরীরটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছেন সীতার দরজায়। চূড়ান্ত অতিনাটুকে ভঙ্গিতে বলেছেন, 'সীতা, অপারেশন কামেয়াব হো গিয়া সীতা। তুমহারা সুহাগ তুমহারা রাম বাঁচ গিয়া।' এই সুসংবাদ দেবার পরমুহূর্তে সংজ্ঞা হারিয়েছেন ধর্মেশ। শনিবারের বারবেলায় আর চেতনা ফেরেনি তাঁর।

ক্যামেরা উঠে গিয়েছে শুন্যে। সাদা-কালো টপ অ্যাঙ্গেল শটে আমরা দেখেছি মৃত ধর্মেশের পাশে মুহ্যমান সীতা আর কয়েকজনকে। আর শুনেছি মহম্মদ রফির গলা, 'জানেওয়ালে কভি নেহি আতে/জানেওয়ালোঁ কি ইয়াদ আতি হ্যায়।' পরমুহূর্তে গান ধরে নিয়েছেন সুমন কল্যাণপুর— 'দিল এক মন্দির হ্যায়, দিল এক মন্দির হ্যায় / প্যার কি জিসমে হোতি হ্যায় পূজা ইয়ে প্রীতম কা ঘর হ্যায়।' যুগলগীতিতে ভর দিয়ে পরদায় ফুটেছে মীনাক্ষী মন্দির থেকে শুরু করে অন্যান্য আকাশচুম্বী দেবদেউলের ছবি। উথলে পড়েছে দৈব আবেগ। জয়জয়কার হয়েছে ধর্মের। এ ধর্ম চিকিৎসক-ধর্ম। তা সে যতই দৈবলাঞ্ছিত হোক না কেন, আমরা বুঝি যে জনগণেশের সম্মতি পেতে তাকে দেবতার থানে সুতো বাঁধতেই হয়।

'দিল এক মন্দির' শেষ হয়েছে অকালপ্রয়াত চিকিৎসকের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত ধর্মেশ মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধন দিয়ে। সেখানে রাম এসেছেন, সীতা এসেছেন, এসেছেন যাঁরা আসার তাঁরা সবাই। আর প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন ধর্মেশের সাশ্রুনয়ন মা। উদ্ঘাটন করেছেন প্রয়াত পুত্রের মর্মরমূর্তির।

যবনিকা পড়েছে

আর আমরা চোখের জলে হাবুডুবু খেয়ে সেই ডাক্তারবাবুকে স্মরণ করেছি যাঁর নাম ধর্মেশ। অর্থাৎ ধর্মের রাজা। রাম-সীতার জোড়ি অক্ষয় রাখতে যিনি নিজের স্বধর্মে অটল থাকেন, প্রেম তো বটেই, পিতৃদত্ত প্রাণটিও উৎসর্গ করতে পারেন।

এতখানি পড়ার পর মনে হতে পারে, ১৯৬৩ সালে যদি হয়েছে, ২০১৩ সালে কেন এমন আর একটি 'দিল এক মন্দির' তৈরি হয় না? এর উত্তর সোজা। আদর্শ মানুষের ধারণা আমাদের চোখে ফিকে হতে হতে এতদিনে উবে গিয়েছে। তাতে কেউ, কোনও পেশাদার মানুষ মানানসই হন না। আজ্ঞে না, কোনও ডাক্তারবাবুও না। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত গৌতম ঘোষের ছবি 'শূন্য অঙ্ক'-এ বিনায়ক সেনের আদলে একজন ডাক্তারবাবুকে দেখা গেলেও তিনি আর নায়ক হতে পারেন না।

এক নিঠুর দরদি জানেন কেন মুন্নাভাইয়ের মতো ফেরেববাজের খপ্পরে পড়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ডাক্তারবাবুদের বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয়।

লেখক পরিচিতি : অংশুমান ভৌমিক—শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প সমালোচক।

ধর্ষণের প্রজাতন্ত্র

এক বিদেশিনী বন্ধু কিছুদিন আগে দিল্লির এক ২৩ বছরের ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও ভয়ঙ্কর হত্যার বিষয়ে জানতে চেয়েছিল—এটা হল তাকে লেখা **সত্য সাগরের** *একটা চিঠি।*

প্রিয় জোয়ানা,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ ভারতীয় হিসাবে আমরা অনেকেই এই ঘটনার জন্যে ভীষণভাবে লজ্জিত কারণ আরো বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই ঘটনা ভারতীয় মেয়েদের ওপর প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া অসংখ্য অত্যাচারকে সামনে এনে ফেলেছে। বাসস্থানহীন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা অপুষ্টিতে ভোগা এই গ্রহের সবচেয়ে বেশি হতদরিদ্র মানুষকে এই দেশে ধারণ করার সাথে সাথে আমরা বোধহয় হয়ে উঠছি একেবারে সামনের সারিতে থাকা এক 'ধর্ষণের প্রজাতন্ত্র'।

তুমি তোমার চিঠিতে জানতে চেয়েছ ঠিক কী কারণে ভারতবর্ষে এত ধর্ষণ হয়? তুমি আরো জানতে চেয়েছ, জনগণের যে দুর্বার ক্রোধ দূরদর্শনে দেখেছ তাতে করে এ বিষয়ে কোন দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব না কতটা।

আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব প্রথমে দিচ্ছি। আমরা শুধু আশা করতে পারি এই সাহসিনী মেয়েটার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না আর এই ঘটনা আমাদের ইতিহাসে একটা বাঁক হিসাবে কাজ করবে। এই ঘটনাক্রমে যে নজিরবিহীন প্রতিবাদ দেখা যায় তাতে করে সরকার, রাজনীতিক ও

আমরা শুধু আশা করতে পারি এই সাহসিনী মেয়েটার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না

গণমাধ্যম এদিকে নজর ফেরাতে বাধ্য হয়। সারা দেশে যুবক-যুবতীদের যেভাবে প্রতিবাদে মুখর হতে দেখা গেছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। ফলশ্রুতিতে এই কথাগুলো উঠে আসছে আরো কঠিন আইন প্রণয়ন, পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা, সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার, স্কুলের পাঠক্রমে লিঙ্গবৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

তবুও আমাদের ইতিহাস বলছে খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মেয়েদের ওপর ঘটে যাওয়া হিংস্রতা কমবে বলে মনে হয় না। আমাকে নিন্দুকের মত শোনালেও তোমাকে বুঝতে হবে আমাদের দেশে এই হিংস্রতার কারণ খুব জটিল এবং তার শিকড়ও খুব গভীরে। ঘটনা হল ঐতিহাসিকভাবে (যেটা তোমাকে বলার দরকার নেই!) পুরুষরা সহস্র বছর ধরে মহিলাদের ওপর শিকারীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকিয়ে আছে আর ভারতীয় পুরুষরা অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নয়। যেটা আমেরিকান নারীবাদি, গবেষক এবং লেখিকা সুসান ব্রাউনমিলার (Suran Brownmiller) সঠিক ভাবে বলেছেন, "প্রাগৈতিহাসিক যুগে আগুন ও পাথরের কুঠারের সঙ্গে পুরুষ মানুষের যৌনাঙ্গও যে ভীতি সঞ্চারকারী অস্ত্র —এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।"

এটা ঠিক জানা যায় না ভারতীয়রা কবে থেকে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল কিন্তু তারা তাদের সহজাত 'অস্ত্রের' ব্যবহার বহুযুগ আগে শিখেছিল এবং তখন থেকেই মেয়েদের প্রতি হিংস্রতা হয়ে উঠেছে আমাদের ইতিহাসের এক প্রধান উপাদান। এক পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় হিন্দু দেবতা ইন্দ্র, যে লাম্পট্যের জন্য কুখ্যাত, অহল্যাকে ধর্ষণ করে। অহল্যা ছিলেন আবার গৌতম নামে এক ঋষির স্ত্রী। যখন ঐ ঋষি জানতে পারেন তিনি চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে প্রথমে অহল্যাকে শাস্তি দেন, তাকে ষাট হাজার বছরের জন্য পাথর বানিয়ে দেন, যতদিন না আর এক পৌরাণিক চরিত্র 'রাম' তাকে স্পর্শ করে পুনর্জীবন দান করে। ইতিমধ্যে ইন্দ্র বিড়াল হয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয় নি। সে জোড়া অভিশাপ পায়—নপুংসক হওয়া এবং ঘটে যাওয়া যে কোন ধর্ষণের অর্ধেক অপরাধ তার উপর বর্তাবে। (যেহেতু ভারতবর্ষের অন্তত অর্ধেক ধর্ষণের মামলার নিষ্পত্তি হয় না এবং সাজা হয় না, আমার মনে হয় ভারতীয় পুলিশ ধরে নেয় যে দেবরাজ ইন্দ্র হচ্ছে অপরাধী এবং সে সর্বদাই পলাতক।)

আমি এই কাহিনী তোমাকে শোনালাম এটা বোঝানোর জন্য যে ইন্দ্র হচ্ছে আবার যুদ্ধের দেবতা আর তাই বোধহয় যুদ্ধ ও ধর্ষণের যে পরিচিত সম্পর্ক সেটা ইন্দ্রের মাধ্যমে এক ধরনের স্বীকৃতি পাচ্ছে।

আমরা দেখি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর অষ্টাদশ শতকে বিদ্রোহ দমনের সময়

শিক্ষাটা খুব পরিষ্কার। যুদ্ধটা সবসময় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের সাথে সাথে মেয়েদের শরীরের উপরেও হয়।

স্কটিশ হাইল্যান্ড মহিলাদের ধর্ষণ, উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকায় বসতি স্থাপনকারী ইউরোপিয়ানদের দ্বারা দেশী 'ইন্ডিয়ান'দের ধর্ষণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের চীনে ধর্ষণ যা কুখ্যাত 'নাংকিং-এর ধর্ষণ' নামে পরিচিত; নাজি যুদ্ধে শতশত ইহুদী মহিলাদের ধর্ষণ অথবা প্রতিশোধ স্পৃহায় বিজয়ী রাশিয়ান সেনাদের জার্মান মহিলাদের ধর্ষণ—শিক্ষাটা খুব পরিষ্কার। যুদ্ধটা সবসময় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষের সাথে সাথে মেয়েদের শরীরের উপরেও হয়। মজার কথা হল সব যুদ্ধই 'মাতৃভূমি' রক্ষার নামে হয়—সম্ভবত এটা মাথায় রেখেই শত্রুপক্ষের মহিলাদের যৌন নিগ্রহ করা হবে।

অবশ্যই একটা বিষয় তুমি সঠিক অনুমান করেছ,

বর্তমান ভারতবর্ষে প্রতিবছর ধর্ষণ বেড়ে চলেছে। একটা হিসাব বলছে ১৯৫৩ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ধর্ষণ ৮৭৩ শতাংশ বেড়েছে, এর কারণ আমাদের দেশে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। গত অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে একটা ক্রমশ তীব্রতর গৃহবিবাদ চলছে যেখানে বিভিন্ন বর্গীয় মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হয়েছে। আর আমাদের ভারত সরকার সামগ্রিক ভাবে তার দেশিয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এই যুদ্ধের কারণটা ভিন্ন। কোথাও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব বা স্বাধীনতার জন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই, কোথাও বৃহৎ প্রজেক্টের কোপে বাস্তুচ্যুতদের লড়াই, কোথাও খনি কোম্পানীদের সঙ্গে লড়াই, আবার কোথাও জাতপাত, শ্রেণী সংগ্রাম অথবা বেপরোয়া নগরীকরণের জন্য কৃষিসংকটের কারণে লড়াই। এবং প্রত্যেকটা যুদ্ধে, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা সবথেকে বেশি মূল্য দেয়—তাদের শরীর সব ধরনের অসম্মানের চিহ্ন ধারণ করে।

ভারতবর্ষের মিলিটারী, প্যারামিলিটারী এবং পুলিশবাহিনী সুযোগ পেলে ধর্ষণ ও যৌননিগ্রহের জন্য কুখ্যাত, বিশেষ করে কাশ্মীর, উত্তর-পূর্বভারত ও মধ্যভারতে যেখানে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। তবে উর্দিধারীরাই একমাত্র দুষ্কৃতী নয়। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, ২০০২-এ গুজরাট কাণ্ডে হিন্দু মৌলবাদীরা অসংখ্য মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল। আবার রাজনৈতিক দাঙ্গায় ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কিস্ট)-এর গুণ্ডাবাহিনী অনেক কৃষক রমণীকে ধর্ষণ করে। যাই হোক সারা ভারতবর্ষে ধর্ষণের যে কটি ঘটনা বিচারালয়ে জ্ঞাত হয়, তাকে বলা যায় ভারতবর্ষের মহিলাদের ওপর ঘটে চলা হিংস্রাচারের নিরিখে সুনামির ঢেউয়ের মাথার ফেনার মত। রাস্তায় যৌননিগ্রহ, অনাচার, বেশ্যাবৃত্তির জন্য শিশু ও নারী পাচার—এ ধরনের অপরাধে দেশটা ভেসে যাচ্ছে।

মহিলাদের ওপর আক্রমণ, বিশেষ করে এদেশে, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে ভয়ঙ্কর জাতপাত বিভাজন এবং যৌনতা ও বিবাহ সম্পর্কে কঠিন সামাজিক নিয়মাবলীর মাধ্যমে। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অন্তর্নিহিত অর্থ একজন ধর্ষণকারীর মানসিকতা থেকে আলাদা কিছু নয়। 'শক্তিমানরা অন্যের দুর্বলতার সুযোগ শুধু নিতে পারে তাই না, নেওয়াই উচিত।' ভারতবর্ষের অনেক অংশে আজও 'উচ্চবর্ণের' পুরুষদের দ্বারা 'নিম্নবর্গীয়' দলিত মহিলাদের যৌন নিগ্রহ প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এবং সেটাকে খুব স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। যদিও তত্ত্বগতভাবে 'উচ্চবর্ণের' মানুষ 'নিম্নবর্ণের' মানুষের সংস্পর্শে এলে 'অশুচি' হয়ে যায় তবুও 'উচ্চবর্ণের' পুরুষ সুযোগ পেলে 'নিম্নবর্ণের' মহিলার সঙ্গে সহবাস করতে বা ধর্ষণ করতে কখনও দ্বিধাবোধ করে না। ভারতবর্ষের মহিলাদের ক্ষেত্রে দাসত্বের আর একটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'বিবাহ' যেখানে মোটা পণ দিয়ে একটা 'উপযুক্ত' স্বামী কিনে নেওয়ার পরে সেই স্ত্রীকে সারা জীবন স্বামীর চাকরগিরি করতে হয়। যদি ক্রয়মূল্য অর্থাৎ পণ মনের মত না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েটি পণের বলি হয়, এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে রহস্যজনক ভাবে কেরোসিন স্টোভ ফেটে গেছে এবং বিবাহিত মেয়েটি পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা যেটা গর্ভপাতের মাধ্যমে বাবা-মার ইচ্ছায় হয়ে থাকে সেটা ভারতবর্ষের অনেকাংশের বহুল প্রচলিত রীতি। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এর

কয়েকটি রাজ্যে মহিলা পুরুষ অনুপাত এমন বিপজ্জনকভাবে নিম্নগামী যেটা থেকে বোঝা যায় যে এসব জায়গায় প্রকৃতপক্ষে 'মহিলা প্রজাতি' হত্যা চলছে।

বেশিরভাগটাই উচ্চবিত্ত অঞ্চলে প্রচলিত। ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি রাজ্যে মহিলা পুরুষ অনুপাত এমন বিপজ্জনকভাবে নিম্নগামী যেটা থেকে বোঝা যায় যে এসব জায়গায় প্রকৃতপক্ষে 'মহিলা প্রজাতি' হত্যা চলছে।

জোয়ানা, তুমি খুব কৌতূহলী এটা জানতে, যে দেশ এতগুলো ধর্মের আঁতুড়ঘর সেখানে কেন মহিলাদের প্রতি এত ভয়ঙ্কর হিংস্রতা? এটা বোঝার জন্যে আমাদের দেশে ধর্মগুলির গভীর নারীবিদ্বেষ এবং আমাদের নারীদের নিম্নবর্গীয় অবস্থানের সম্পর্কে খতিয়ে দেখতে হবে। আর তার সঙ্গে দেখতে হবে নারী এবং যৌনতা সম্পর্কে এই ধর্মের দ্বারা লালিত পুরুষদের ভণ্ড দৃষ্টিভঙ্গী। আমাদের দেশে মহিলাদের প্রতি বেশীরভাগ মানুষ যে মনোভাব পোষণ করে তা তৈরী করছে যৌনতা সম্পর্কে প্রবলভাবে রক্ষণশীল তিনটি পুরুষতান্ত্রিক গোষ্ঠী। এগুলো হল ভণ্ড-তপস্বী ব্রাহ্মণ-বাদীরা যারা সহস্র বছর ধরে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্য করেছে। এরপর এসেছে মুসলিম শাসকরা, যারা কয়েক শতাব্দী শাসনকালে এই সংস্কারাচ্ছন্নতায় আরো প্রলেপ লাগিয়েছে। সবার শেষে এসেছে ঔপনিবেশিক জেদি ভিক্টোরিয়ান সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রিটিশরা, যারা শালীনতার ভণ্ডামিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে যৌনতা সম্পর্কিত সবকিছুকে 'পাপের' সমার্থক করে প্রচার করেছে। হিন্দুত্বের ব্রাহ্মণবাদী চিন্তায় ধরা হয় যারা যৌনতাকে একেবারে অস্বীকার করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে তারা হচ্ছে মহান সন্ন্যাসী, কারণ তারা তাদের 'আদি কামনার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছে।' অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে, যেহেতু যৌনতা নানারকম দেহের রসের সঙ্গে সংযুক্ত তাই এটা একটা অশুচি কাজ এবং কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যেই মাসে মাসে যৌন সংসর্গ করা যায়। রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের বিশ্বদর্শনে নারীদের ধরা হয় পুরুষদের আধ্যাত্মিক উন্নতি করে মোক্ষলাভের পথে বাধাস্বরূপ। ফলত আমরা কী পেলাম? ভারতীয় পুরুষরা ভান করছে যৌনেচ্ছা ও যৌনতাকে 'দমন' করার, কিন্তু সামান্যতম সুযোগ পেলেই লালসার সদ্ব্যবহার করছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই বিশ্বদর্শনে নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে যারা কম খেয়ে বেশি কাজ করতে থাকে এবং যাদেরকে ইচ্ছেমত হত্যা করা যায়।

ইসলামের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, এর ঈশ্বরতত্ত্ব যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই ধর্মে পুরুষ মানুষ প্রায় যা ইচ্ছা করতে পারে এবং মহিলাদের ওপর নানা রকম বাধা নিষেধ চাপান আছে। মহিলাদের অনেক ক্ষেত্রে 'অসম্পূর্ণ' মানুষ ভাবা হয় এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের মনুষ্যেতর জীবের মত ভাবা হয়। কোন মহিলাকে যদি অবৈধ যৌনাচার করেছে বলে 'বিচারে' কোনোমতে প্রমাণ করা যায়, তবে তাকে নৃশংস শাস্তি দেওয়া হয়।

ভারতীয়দের দুর্ভাগ্যের ষোলকলা বোধহয় এই সাঁড়াশি আক্রমণেও পূর্ণ হয়নি, তাই পরের দুশো বছর এই হতভাগাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। এই নাক-উঁচু ব্রিটিশরা গর্ব করে বলত তারা 'সভ্যতার কারিগর' হিসাবে এদেশে এসেছে আর 'দেশীয় অসভ্যদের' অনিয়ন্ত্রিত আবেগকে তাদের 'হীনতার' নিদর্শন হিসাবে তারা দেখত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের বদ্ধ

ধারণা যে যৌনাচার হচ্ছে 'আদি পাপ'—সেটা এসেছে আগের ইহুদী খ্রীষ্টান ধারণা থেকে। আর ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসন পরবর্তীকালে এই ধারণাকে সাদরে গ্রহণ করে লিখিত আইন তৈরী করে ফেলল। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সমকামিতা, অবৈধ সম্পর্ককে যেখানে কিছু ক্ষেত্রে ভালোভাবে গৃহীত হত বা কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতার মাপকাঠিতে বড়জোর ভ্রূ কোঁচকানোর বিষয় বলে ভাবা হত, ব্রিটিশরা সেই সব আচরণকে আইন করে 'অপরাধ' হিসাবে গণ্য করতে শুরু করল—যেখানে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারবে।

ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আজও খুব সম্ভবত, এই পৃথিবীতে ব্রিটিশ ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধের সবথেকে বড় ধারক ও বাহক। সত্যি কথা বলতে কি যৌনতা ও সম্পর্কিত যা কিছু 'ভারতীয় মূল্যবোধ' যা 'নৈতিকতা' হিসাবে চলে তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে আঞ্চলিক সংস্কারের সঙ্গে আমদানী করা ঔপনিবেশিক ধারণার সহবাসে তৈরী। যৌনতা ও লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে রক্ষণশীল মানসিকতা নিয়ে কিছু বলার থাকত না—যদি না সাধারণ মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের ভয়ঙ্কর পরিণতি হত। যৌনতা সম্পর্কে কতগুলি 'পালনীয়' এবং কতগুলি 'নিষিদ্ধ' সামাজিক বিধিকে ভারতীয়রা যত বেশি মেনে চলে তত বেশি করে তারা অন্যান্য সামাজিক সমস্যাকে অবহেলা করে—সামাজিক ন্যায়, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্য, সাম্প্রদায়িক হিংসা—লম্বা তালিকা।

যৌনেচ্ছা ও যৌনতাকে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পথে অনুশীলন করার অক্ষমতার জন্য ভারতীয় সমাজে পুরুষদের মধ্যে হিংস্রতার প্রতিফলন প্রায়ই হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কিত কারণ ছিল ২০০৬ সালে হত্যা বা হত্যা প্রচেষ্টার প্রথম তিনটি কারণের একটি।

যৌনেচ্ছার স্বাভাবিক প্রকাশ বা এমনকি খুব স্বাভাবিক সভ্যভাবে ভালোবাসার প্রকাশকেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে এমনভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় যে যার ফলে ক্রোধ হচ্ছে যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ, এবং তার ফল হচ্ছে ধর্ষণ ও হত্যা। তাই 'ধর্ষণের প্রজাতন্ত্র' সাথে সাথে ভারতবর্ষ বোধহয়

যৌনেচ্ছা ও যৌনতাকে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পথে অনুশীলন করার অক্ষমতার জন্য ভারতীয় সমাজে পুরুষদের মধ্যে হিংস্রতার প্রতিফলন প্রায়ই হয়।

'ভালোবাসার কবরখানা' তকমাও পেতে চলেছে। বিশ্বাস করো এই দুটো প্রবণতা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আমরা কি এমন কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি যে মনে হয় ভারতীয় পুরুষরা মহিলাদের প্রতি তাদের আচরণ পাল্টাতে পারে? আমি এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে শুধু বলতে পারি—আমি মনে করি আশা আছে। আশা রাখি এই জন্যে যে এই বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে ব্রাহ্মণবাদী হিন্দু সংস্কৃতিই কেবলমাত্র জনগণকে প্রভাবিত করে না, 'হিন্দু' নামে পরিচিত আশি কোটি ভারতীয়দের অদ্ভুত রকম লৌকিক সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের বৈচিত্র্যও প্রভাবিত করে।

আমাদের দেশের দলিত বুদ্ধিজীবীরা অনেকদিন ধরেই দেখাচ্ছেন যে তথাকথিত 'নিম্নবর্ণের' মানুষরা যে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে তা তথাকথিত 'উচ্চবর্ণের' নারীবাদী মহিলারাও ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। একইভাবে আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় মহিলারা জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষদের মত সমমর্যাদা পায় না কিন্তু সামাজিকভাবে অনেক উঁচু স্থানে বিরাজ করে। যদিও পুরুষতন্ত্র হিন্দুত্বের মাধ্যমে বর্তমান ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব করছে তবুও ঐতিহাসিক ভাবে নারীশক্তিও যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সেইজন্যে 'উচ্চবর্ণের' মূল্যবোধ সবসময় অসংখ্য মাতৃদেবীর আরাধনার মাধ্যমে, যেগুলো খুবই প্রাচীন বিশ্বাস, হয়ত হিন্দুত্বেরও পূর্ব ধারণা, সারা ভারতবর্ষে কঠিন প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হয়েছে। একই ভাবে ভক্তিবাদী আন্দোলনের, যেটা ত্রয়োদশ শতকে পূর্বভারতে শুরু হয়েছিল, মূল ধারণা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের মধ্যে নারীসত্ত্বাও আছে। তাই তার অনুরাগী সমস্ত নারী-পুরুষ ভক্তই তার প্রেমাস্পদ।

ভারতে ইসলাম, খ্রীষ্টান এবং অন্য ধর্মেও নারীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্যে প্রচলিত মতবাদের বিপরীত স্রোতও দেখা যায়। এরা গোঁড়া ধর্মীয় নারীবিরোধী চিন্তা থেকে বেরিয়ে যৌনতা, মানুষের শরীরকে মর্যাদা দেওয়া এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে অন্য পথে ভাবার উপাদান দিয়ে গেছে। 'সুফি' সম্প্রদায় যারা হিন্দুধর্মের 'ভক্তিবাদীদের' সমতুল্য বলা যায়, অনেক মানুষকে এখনও আকর্ষণ করে মূলত তাদের নরমপন্থী এবং শক্তিদম্ভহীন রাস্তায় সাধনার জন্যে। একইভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আধুনিক ভারতের গ্রাম বা শহরের মেয়েরা অত সহজে পুরুষের বশে থাকতে চাইছে না এবং তারা তাদের মত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লড়াই চালাচ্ছে।

আমাদের দেশের এই ঐতিহ্যগুলো একটা দিক নির্দেশ করছে---মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো নারীসুলভ বলে ভাবা হয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলো

পরেরবার ভারতে আসার আগে একটা ছুরি তোমার ব্যাগে ভরতে ভুলো না

হচ্ছে জীবন ও সমস্ত সৃষ্টিশীল কর্মের উৎস, সেগুলোকে 'অশুচি', 'অমঙ্গলসূচক' বা 'পাপ-পূর্ণ' বলে ভবিষ্যতে হেয় করা হবে না। বরং হয়ত একদিন এই উপলব্ধি আসবে এগুলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা আমাদের এই বিশ্বকে অসাধারণ করে তুলেছে।

একান্তই তোমার

সত্য

পুনশ্চ : যদিও আমি আমাদের দেশ নিয়ে এখনও ভীষণ আশাবাদী কিন্তু পরেরবার ভারতে আসার আগে একটা ছুরি তোমার ব্যাগে ভরতে ভুলো না যেন। ভারতবর্ষের মত বিশাল একটা দেশে সহজে কিছু পাল্টায় না তাই আফশোস করার থেকে নিরাপত্তা ভালো।

স্মরণে

দীপংকর চক্রবর্তী : এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব

সুমিতা দাস

কীভাবে বর্ণনা করি দীপংকর চক্রবর্তী, আমাদের দীপংকরদাকে? একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী? এক দৃঢ়চিত্ত আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, এমন এক মানুষ যিনি পঞ্চাশ বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট আদর্শভিত্তিক পত্রিকা চালিয়ে যেতে পারেন, যেতে পারেন নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে—অবিচল? যাঁর অনুদিত ও প্রকাশিত 'বিপ্লবের গান' পড়ে সত্তর-আশির দশকে অনেকেই বিপ্লবের প্রতি প্রাণিত হয়েছেন? যে মানুষটি পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলনের, বন্দীমুক্তি আন্দোলনের উৎসাহী সংগঠক? প্রাবন্ধিক, লেখক, অনুবাদক? এমন এক অধ্যাপক যিনি তাঁর ছাত্রদের সিলেবাসের পড়াশুনার পাশাপাশি শিখিয়েছেন বিতর্ক, আবৃত্তি, উৎসাহ দিয়েছেন সাংস্কৃতিক ও সুস্থ রাজনৈতিক কাজকর্মে? যিনি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম-লালগড়, খাম্মাম থেকে নেপাল ছুটে যান গণআন্দোলনের ডাকে? তসলিমা কলকাতা থেকে বিতাড়িত হলে বা নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চললে যিনি নিজে তো বটেই, অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদেরও সংগঠিত করার চেষ্টা করেন এর বিরোধিতায়?

দীপংকর চক্রবর্তী ছিলেন এর সবগুলোই, এবং আরো অনেক কিছু। দুপাতার মধ্যে তাঁর কাজ ও তাঁর ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা এক দুরূহ প্রয়াস।

১৯৪১ সালে দীপংকরদার জন্ম এখনকার বাংলাদেশে, তবে শৈশবেই পরিবারের সঙ্গে চলে আসেন এপার বাংলায়— বহরমপুর শহরে। তাঁর কৈশোর-যৌবন পশ্চিমবঙ্গে এক উথালপাথাল সময়। ৬০-এর দশকে আন্দোলনের জোয়ার, খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি। আবার অন্য দিকে ভারত-চীন যুদ্ধ ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতার জোয়ার। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যাওয়া। সরকারি সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা। এই সবের মধ্য দিয়ে চলেছে দীপংকরদার রাজনৈতিক জীবন। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী, বিপ্লবপন্থী। প্রায় কখনও কোনো পার্টির সদস্য না হলেও সমাজে যে রাজনৈতিক আলোড়ন চলেছে তাতে সবসময় তাঁর জোরালো উপস্থিতি থেকেছে। সত্তরের দশকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে, কখনো বা সংসদ-সর্বস্বতার রাজনীতির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো বা খতমের রাজনীতির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে।

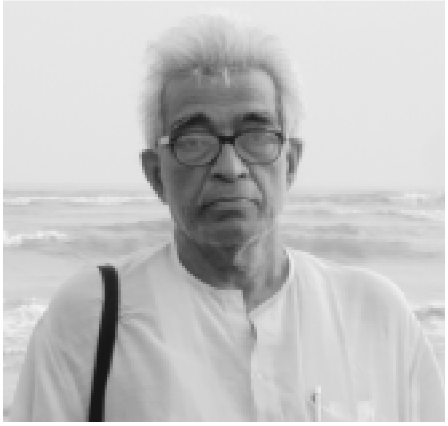

জন্ম : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪১
মৃত্যু : ২৭ জানুয়ারি, ২০১৩।

যে কোনো সমাজেই কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে কাজ করে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সেই কঠিন কাজটা দীপংকরদা করে গেছেন, প্রধানত অনীক পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বিভিন্ন বিষয়ে অনীক আলোচনা চালিয়ে গেছে। গত পাঁচ দশকের এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কোনো দিক নেই যা নিয়ে অনীক পত্রিকায় লেখালেখি, বিতর্ক হয়নি। পাশাপাশি এ সময়ের অনেক উল্লেখযোগ্য গল্প, কবিতা অনীকে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ-সাহিত্য দীপংকর চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। 'বিপ্লবের গান'-এর কথা আগেই বলেছি। এছাড়াও অনেক অনুবাদ তিনি করেছেন, তার মধ্যে আছে মাও-এর লেখা প্রবন্ধ থেকে চীনা অপেরা ও উপন্যাস। আছে বেশ কিছু কবিতা। তিনি নিজেও লিখেছেন নাটক, কবিতা, গল্প, বই। গড়ে তুলেছেন একটি প্রকাশনা সংস্থা, যা থেকে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় বই-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন একুশে'র কবিতা ও গান থেকে মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ পল সুইজি-র সংকলন গ্রন্থ।

এসব কাজের মাশুলও দিতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির কয়েক দিনের মধ্যেই মিসা নামক কালা কানুনে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। উনিশ মাস থাকতে হয় কারাগারে বন্দী। সেখানেও কিন্তু তাঁর মতাদর্শ থেকে গেছে অটুট। জেলের মধ্যে কাজ করেছেন যাতে বন্দীরা তাদের আইনি অধিকার পায়, তরুণ বন্দীদের সাহায্য করেছেন পড়াশোনায়, মার্কসবাদী সাহিত্যপাঠে। অন্যদিকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের একসাথে থাকা-খাওয়া-গণসঙ্গীত গাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সবার মনোবল বাড়ানো। মনে রাখতে হবে, সেটা জরুরি অবস্থার সময়।

জরুরি অবস্থার অবসান ও নির্বাচনে ক্ষমতার হাতবদলের পর অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দীপংকর চক্রবর্তীও ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পর একই ধরনের উদ্যম নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া শুরু হয়ে গেল। প্রায় দু'বছর বন্ধ থাকা অনীকও আবার প্রকাশিত হতে শুরু করলো।

দীপংকরদা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলনের এক পুরোধা। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-এর প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তাতে উৎসাহী সংগঠক। বহরমপুরের বসবাসকারী দীপংকরদার প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে গড়ে ওঠে এপিডিআর-এর প্রথম শাখা, খুব জীবন্ত শাখা। মুর্শিদাবাদে হরিহরপাড়ার দাঙ্গা থেকে শুরু করে পুলিশ লক-আপে অত্যাচার, উপস্থিত এপিডিআর ও দীপংকরদা। এসব ২০০৩ সাল পর্যন্ত, যখন দীপংকরদা বহরমপুরের বাসিন্দা, সেখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। ২০০৩ সালে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। তারপর এপিডিআর-এর কেন্দ্রীয় শাখায় তিনি থেকেছেন নেতৃস্থানীয় সংগঠক। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন তার সহ-সভাপতি।

এবার বলি তাঁর অন্যান্য কাজকর্মের কথা। বহরমপুরে তিনি তৈরি করেন একটি স্থানীয় পাক্ষিক

পত্রিকা। মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ। স্থানীয় সাধারণ সংবাদ থেকে সরকারি-বেসরকারি দুর্নীতি উদঘাটন, তৎকালীন শাসক দল ও বিরোধী দলের দুর্বৃত্তায়ন—এসব বিষয়ে সাহসী ও তৎপর এই পত্রিকাটি ১৯৮৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। বহরমপুর থেকে চলে আসার আগে তিনি এর দায়ভার তুলে দেন সহকারীদের হাতে, যাতে তিনি চলে এলেও পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে আগের মতোই। শুধু মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ নয়, বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ বলে একটি পত্রিকা বের করে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ ও ইতিহাসের একটি চিত্র তুলে ধরার কাজ করেছেন।

একজন গুণমুগ্ধ সেদিন বলছিলেন, দীপংকরদা বহরমপুর থেকে চলে আসার পর বহরমপুর তার রঙ ও দীপ্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ বহরমপুরে দীর্ঘকাল বাসকালে দীপংকরদা একের পর এক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মের উদ্যোগ নিয়েছেন। কলকাতার বাইরে প্রথম সিনে ক্লাব গড়ে তোলা হয় বহরমপুরে। কলকাতা থেকে ভালো ছবি নিয়ে গিয়ে বহরমপুরে দেখানো, কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি পেশ করে সেখানে ঋত্বিক প্রেক্ষাগৃহ গড়ে তোলা। বইমেলা সংগঠিত করা, সেখানে বিশেষ করে কুসংস্কার বিরোধী, প্রগতিশীল বই যাতে আসে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া।

সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বহরমপুরে তাঁর উদ্যোগে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি পরিষদ। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি নানা ধরনের অপসংস্কৃতির বিরোধিতা করে গেছে তারা। মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘেও দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

ভারত ও চীন দুই প্রতিবেশী মহান দেশ। এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী দুই দেশকেই সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু রাজনীতির কারবারীদের হিসেব অন্য। চীন বিরোধিতার পথ দিয়ে তাদের কিছু কার্যসিদ্ধ হয়। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গড়ে তোলা হয় ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি। তাতেও সক্রিয় ছিলেন দীপংকরদা।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল দীপংকরদার। এর সূত্রপাত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে লেখালেখির মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে অনীক-এর পাঠকও ছিলেন অনেক। বারবার তিনি বাংলাদেশ গেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে গেছেন। এসবের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে তিনি যখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের তরুণ শিক্ষক। বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলে পুনশ্চ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তার মুখপত্র হিসাবে পুনশ্চ নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করতে শুরু করেন। তার পরে পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় অনীক। ত্রৈমাসিক থেকে সেটি হয় মাসিক। চরিত্রও মূলত সাংস্কৃতিক থেকে হয় সামাজিক-রাজনৈতিক।

অর্থনীতির এই তরুণ অধ্যাপক শুধু অর্থনীতির ছাত্রদের শিক্ষক ছিলেন না। সব ছাত্রদেরই তিনি শিক্ষক। ক্লাসের বাইরে বিতর্কের ক্লাস। ছাত্রদের শেখান কীভাবে যুক্তিজাল বুনতে হবে, কীভাবে বক্তব্যকে মনোগ্রাহী ও জোরালো করে তুলতে হবে। এই অধ্যাপক ছাত্রদের একাধারে বন্ধু, অন্যদিকে অভিভাবকের মতো পরামর্শদাতা। দলাদলি নয়, ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক বোধ গড়ে তোলার চেষ্টা তাঁর। পাশাপাশি এ কথাও বলা দরকার, অন্য কাজ করার জন্য অধ্যাপনায় ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না এই অধ্যাপক। তাই তাঁর ছাত্ররা এখনও তাঁর গুণমুগ্ধ।

অধ্যাপক সমিতিতেও তিনি উৎসাহী অংশগ্রহণকারী। অবসর গ্রহণের পরেও কৃষ্ণনাথ কলেজের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজের উন্নতিকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার কথা শুনছিলাম সেদিন তাঁর এক ছাত্রের কাছে।

২০০৩ সালে কলকাতায় চলে আসার পর তাঁর জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। অনীক ও কেন্দ্রীয় এপিডিআর শুধু নয়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক জোয়ার আসে। অনেক দিন পর শোনা যায় রাজনৈতিক প্রতিবাদের জোরালো স্বর। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-রিজওয়ানুর কান্ড। প্রতিটি সংগ্রামের পাশে থাকা নাগরিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক অগ্রণী জন। সরকারি নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশিত করার জন্য যাঁরা এ পর্বে কাজ করেছেন, পথসভা থেকে কনভেনশন, মিছিল থেকে টেলিভিশনের পর্দায় এই সংগ্রামের পাশে থেকেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন দীপংকর চক্রবর্তী।

সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অন্যায় অবিচার থেকে গেছে। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। ঘটে যাচ্ছে কার্টুন কান্ড থেকে নোনাডাঙা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্লান্ত হননি দীপংকরদা।

এসব তো শুধু কাজের হিসাব। একটি জীবনে এতদিন ধরে এতগুলি কাজ করলেন কী করে তা বিস্ময় জাগায়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বিস্ময় জাগায় তাঁর চরিত্র। যে চরিত্রের কারণে নানা রাজনৈতিক রঙের মানুষ তাঁর গুণগ্রাহী। সিকিমের ভারতভুক্তি নিয়ে ভারত সরকারের নীতিকে প্রশ্ন করার কারণে কারাবাস শ্রদ্ধা জাগিয়েছে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার বহুদিনের সম্পাদক সুনন্দ দত্তরায়ের। নিজের মতাদর্শে দৃঢ় থেকে, নিজের মতামত জোরালোভাবে রেখে পাশাপাশি অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা সহকারে শোনা, তাঁর পত্রিকায় এইসব বিতর্ককে জায়গা দেওয়াটাই ছিল দীপংকর চক্রবর্তীর রাজনীতি। কিন্তু সেটা গণতান্ত্রিক, বামপন্থী চিন্তার ক্ষেত্রে। যাদের তিনি গণশত্রু বলে মনে করতেন তাদের তীব্র কাষাঘাত করতে কোনও দ্বিধা ছিল না তাঁর।

অনীক, এপিডিআর, এই দুই সংগঠনে তাঁর সহকর্মীরা বারবার বলছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে সদা প্রস্তুত ছিলেন তিনি। তাঁর সহকর্মীরা জানেন, তাঁর গণতান্ত্রিকতা মিটিং মিছিলে শেষ হয়ে যেত না। প্রকাশ পেত কাজের ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মীকে সমান মর্যাদা দেওয়ায়, কোনো কাজকেই ছোট কাজ মনে না করায়, বিরোধী বক্তব্যও মনোযোগ দিয়ে শোনায়, ভুল করে ফেললে কনিষ্ঠতম ব্যক্তির কাছে মার্জনা চেয়ে নেওয়ায়। তাঁরা দেখেছেন, অসুস্থ শরীরকে অগ্রাহ্য করে কীভাবে তিনি কাজ করে গেছেন। বলেছেন, তাঁর স্বচ্ছতার কথা, জীবনের রস উপভোগ করার কথা। যেখানে গেছেন তিনি, সবাইকে হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখতেন। সাহিত্য, গান ও ভালো নাটক, সিনেমার একজন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন।

পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন তরুণ লেখক, কবিদের। ছোট লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে। মুর্শিদাবাদে লিটল ম্যাগাজিনগুলির একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। আর কলকাতায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় সমিতি গড়ার পেছনেও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না।

দীপংকর চক্রবর্তীর চলে যাওয়া তাই শুধু একজন বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ব্যক্তির জীবনের অবসান নয়, এমন একজন শিক্ষকের চলে যাওয়া, যিনি তাঁর সারা জীবনব্যাপী কাজের মধ্য দিয়ে শিখিয়ে গেছেন কীভাবে বাঁচতে হয়।

স্মরণে

মনতোষ মণ্ডল

(১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৭-১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৩)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-তে সুন্দরবনে মোটর-চালিত নৌকোয় ভ্রমণের বিজ্ঞাপনে থাকত তাঁর নাম, ফোন নম্বর—মনতোষ মন্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেন্সিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর সম্পাদক। নবম সংখ্যাতেও ছিল, নবম সংখ্যা যখন বাঁধাই হচ্ছে তখন এল মুম্বইয়ে তাঁর মৃত্যুর খবর। এক মাস আগে লিভারের ক্যান্সার ধরা পড়ে—হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, চিকিৎসা খুব একটা কিছু করার ছিল না।

২০০৯-এর ২৫শে মে-র বিধ্বংসী আয়লা-র পর সুন্দরবনে চিকিৎসা-ত্রাণ সংগঠিত করা নিয়ে এক সভা ডেকেছিল আমাদের সংগঠন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, সেইখানেই মনতোষদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। জুনের প্রথমে আমাদের চিকিৎসাদল যায় তাঁর গ্রাম জেমসপুরে, তারপর আরও কয়েকবার। দু'দফায় জেমসপুরের ৮জন মহিলা ও ৫জন পুরুষকে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেমসপুরে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সহায়তায় 'সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা'-র কাজ শুরু হয়। বারবার আমাদের চিকিৎসকরা ক্যাম্প করতে যেতে থাকেন। রোগী পরিবহন, মেডিক্যাল টীমের যাতায়াত ও স্বাস্থ্য-পরিষেবা চালানোর খরচ তোলার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের বন্ধুদের সহায়তায় এক মোটর-চালিত নৌকো কেনা হয়। ২০১৩-র মার্চ থেকে প্রতিমাসে ৭ দিন সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে এই নৌকো করে ঘুরে-ঘুরে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। যে সময় মনতোষদাকে খুব দরকার, সে সময়েই চলে গেলেন তিনি।

অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর —সুন্দরবনের বিধবা ও অনাথদের স্বাবলম্বী করে তোলার স্বপ্ন, দাইদের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নিরাপদ প্রসব-ব্যবস্থার স্বপ্ন। সুন্দরবন জুড়ে যখন ছড়িয়ে পড়ছে ভ্রমণ-ব্যবসায়ীদের জাল, তখন মনতোষদা ভাবতেন কম খরচে এক পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন-পরিষেবা গড়ে তোলার কথা। স্বপ্নগুলো অপূর্ণ রয়ে গেল।

কাঁচরাপাড়ার পূর্ব রেলের ওয়ার্কশপের কর্মী ছিলেন তিনি। চাকরী করে, সংসার চালিয়ে ভালোই থাকতে পারতেন তিনি। তা না করে নিজের গ্রামের উন্নয়নের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, বাস্তবত সে সংগঠনের একমাত্র সংগঠক হিসাবে কাজ করা, সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি—মাইনে কাটা যাওয়া—কেন এমন পথ বেছে নেন একেকজন মানুষ?

সুন্দরবনে জঙ্গল কেটে মনুষ্য-আবাদ তৈরী হচ্ছে ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের নেতৃত্বে, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার শিবচন্দ্রপুর থেকে জেমসপুরে এসে বসত শুরু করেন মনতোষ মন্ডলের ঠাকুর্দা চন্ডীচরণ মন্ডল। জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ, সঙ্গে প্রাকৃতিক নানা প্রতিকূলতা। চন্ডীচরণের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের ৭ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় মনতোষ।

সুন্দরবনের সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্লিনিকে অন্যান্যদের সঙ্গে মনতোষ মন্ডল

জেমসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মনতোষের বিদ্যালাভের শুরু। তারপর ভর্তি হলেন সেকেন্ডারী স্কুল রজত জুবিলী হাই স্কুলে। স্কুলের মাইনে সে সময় মাসে ৩ টাকা, বছরে ৩৬ টাকা। ৩৬ টাকা জোগাড় করা গেল না ক্লাস সিক্সে, জোগাড় হল ২৪ টাকা, হেড মাস্টারের অপমানে বিদ্ধ বাবা মনতোষকে এ স্কুল ছাড়িয়ে ভর্তি করলেন আমতলি অমৃতলাল হাই স্কুলে। বৃত্তি পেয়ে পড়াশুনা চলল, সেখান থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ। প্রিইউনিভার্সিটি পাশ পাঠানখালির হাজি দেশারত কলেজ থেকে, বাংলায় বিএ গোবরডাঙ্গার সরকারী কলেজ থেকে। বাবার আয়ে খরচ কুলতো না, দাদা সন্তোষও তখন কলেজে পড়ছেন। ভাইকে পড়ানোর জন্য দাদা ছুটির দিনগুলোতে দিনমজুরী করতেন। যে পরিবারগুলোতে মনতোষকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল পড়াশুনার জন্য তাঁদের ফাইফরমাশ খাটতে হত।

বিএ পাশ করার পর ১৯৭৮ থেকে, ৮২ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ক্রেসিডা'-এ কাজ করেন। ১৯৯০-এ রেলের চাকরী পাওয়ার আগে অবধি প্রাইভেট টিউশনি, বীমার এজেন্সি, ব্যবসা, ছোট ঠিকাদারী করে দিন গুজরান করেন মনতোষ। এ সময়ে অবশ্য তিনি কলকাতার বাসিন্দা, এখন যেখানে পিয়ারলেস হাসপাতাল, তার পিছনে এক জলাজমিতে স্থাপিত বসতিতে ভাইয়েরা থাকা শুরু করেন।

যখন স্বচ্ছল, যখন শহরের বাসিন্দা, তখনও নিজের অতীত জীবনের কথা, নিজের গ্রামের কথা, গ্রামবাসীদের দুর্দশার কথা কখনও ভোলেন নি মনতোষ। সেখান থেকেই সংস্থা গড়ে তোলা, সুন্দরবন কমপ্রিহেন্সিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার নামে যে সংস্থা সোসাইটি হিসেবে নথিভুক্ত হয় ২০০৯-এ। অন্যান্য অনেক এনজিও-র মত সরকারী-বেসরকারী ফান্ডিং এজেন্সির ফান্ড নিয়ে মোচ্ছব করাই যেত। তা না করে মনতোষদা বেছে নিয়ে ছিলেন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সঙ্গে থেকে স্বাবলম্বনের পথ, সংগ্রামের পথ।

ঐতিহাসিক ভাবেই মনেতোষদার ঘনিষ্ঠতা ছিল পূর্বতন শাসক দলের সঙ্গে। তাঁর দাদাও ছিলেন বামফ্রন্টের এক শরিক দলের গ্রাম-পঞ্চায়েত সদস্য। আমাদের কেউ কেউ প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় পেলে দূরে সরে যেতে পারি এই আশঙ্কায় রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে যেতেন প্রথম প্রথম। আমরা অনেকেই নাস্তিক, উনি ভগবৎ-বিশ্বাসী---এই প্রসঙ্গেও কথা খুব দূর এগোত না। কিন্তু এসব তো তাঁর খন্ড-পরিচয়, বড় পরিচয় এটাই যে মানুষটি স্বচ্ছল হয়েছেন, আরও স্বচ্ছল হতে পারতেন, সে পথে হাঁটেননি। ভুলে যাননি সেই জনসমুদায়কে যাঁদের মধ্যে থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন।

— পুণ্যব্রত গুণ

আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—কিছু আশা কিছু আকাঙ্ক্ষা

প্রিয় সম্পাদক,

চিকিৎসার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, এক মানবাধিকারও বটে। ধনী দেশগুলির চিকিৎসাশাস্ত্র উন্নতমানের, কিন্তু চিকিৎসাব্যবস্থা কি সমদর্শিত? সামান্য কটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ব্যতীত কোন উন্নত দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের নয়। অতএব দেশের সমস্ত নাগরিকের চিকিৎসার সমানাধিকার নেই। এমনই এক উন্নত দেশ হল আমেরিকা, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় বেশ নিম্নমানের। এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতির উপর লেখা ঈপ্সিতা পাল ভৌমিকের ''আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা - স্বপ্ন, সত্যি, ও ভবিষ্যৎ'' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। (**স্বাস্থ্যের বৃত্তে**, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৩)।

আমেরিকার চিকিৎসাব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের না হওয়ায় দেশবাসীর দুর্ভোগের শেষ নেই। বয়স্ক এবং দরিদ্রের জন্য সহজলভ্য মেডিকেয়ার এবং মেডিকেইড নামে দুটি জনপ্রিয় সরকারি ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তারও বিস্তর ফাঁকফোঁকড় যা সম্পূর্ণ বন্ধ করা দুরূহ। দেশবাসীর মনে সমাজতন্ত্রের প্রতি এমন সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে যা প্রায় প্যারানইয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে। উপরন্তু, বীমা কোম্পানির দয়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেভাবে লাভবান ব্যবসায় পরিণত হয়েছে সে সম্বন্ধে ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক তাঁর প্রবন্ধে যথার্থ আলোচনা করেছেন।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তাঁর দলের প্রগতিশীল গোষ্ঠি ২০১০ সালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংশোধনী বিল পাশ করে, যা ''অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট'' নামে পরিচিত। চরম ডানপন্থী টি-পার্টি এ বিলের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালায় এবং বিলটিকে 'ওবামাকেয়ার' নামে এক প্রচ্ছন্ন জাতিগত বিশেষণে ভুষিত করে, এমনকি একে অসাংবিধানিক প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট ওবামা, যাঁকে লেখিকা 'ওবামা সাহেব' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, অবশ্য বিশেষণটি অত্যন্ত পটুতার সঙ্গে আপন করে নেন ঠিক যেমন জাতিবৈশিষ্ট্য-জাত 'বাঙাল' শব্দটা বাঙালরাই আপন করে নিয়েছেন। উপরন্তু সুপ্রিম কোর্টের এক দক্ষিণপন্থী বিচারকও যখন 'ওবামাকেয়ার' সাংবিধানিক ঘোষণা করেন এবং এটি দেশের সংশোধিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিপন্ন হয় তখন টি-পার্টি পিছু হঠতে বাধ্য হয়। কিন্তু এত সত্ত্বেও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে লেখিকার বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়।

প্রবন্ধটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ও এটির বক্তব্য আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তবুও কয়েকটি বিষয়ে লেখিকা তাঁর মন্তব্য উহ্য রেখেছেন। প্রবন্ধের বিষয়টি এতই জটিল এবং বিস্তৃত যে এক দফায় সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ বোধহয় সম্ভব নয়। এই পত্রে আমার প্রচেষ্টা হল অন্তত এমন দুটি বিষয়ে কিঞ্চিত দৃষ্টি আকর্ষণ করা---যে দুটি বিষয় আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক, বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবসায়িক মানসিকতা। এবং দুই, আমেরিকার ইমারজেন্সি কেয়ার যা নিঃসন্দেহে মানবিক কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কারের উর্দ্ধে নয়।

আমেরিকার সম্ভ্রান্ত হাসপাতালগুলির বেশিরভাগই বেসরকারি এবং অনেক ক্ষেত্রে 'ফর প্রফিট' ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আর সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত হাসপাতালগুলিরও একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। এমন ঘটনা বিরল নয় যে সামান্য হাসপাতাল ভিজিটের পরে হাজার হাজার ডলারের বিল হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিল পরিশোধ করতে ব্যাঙ্করাপ্সির কথা তো শ্রীমতী পাল ভৌমিক তাঁর প্রবন্ধেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এমন সব সাংঘাতিক পরিমাণ বিল আসে কেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন বিল হাসপাতালের ইচ্ছাকৃত। বীমা কোম্পানির থেকে যথাসম্ভব অর্থ আদায় হল এই কৃত্রিম বিল তৈরীর প্রধান উদ্দেশ্য। রোগীর বীমা কোম্পানি যদি ক্ষমতাশালী হয় তবে তারাই হাসপাতালের বিলিং বিভাগের সাথে মধ্যস্থতা করে বিলের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। যার বীমা কমদামি বা কম স্বনামধন্য হয় তার হয়ে কোম্পানির মধ্যস্থতাও দুর্বল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাসপাতাল জয়ী হয়। ফলে বীমা কোম্পানিকে বা রোগীকে অকারণ বেশি টাকা খরচ করতে হয়। হাসপাতালের এই লাভের শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগী কারণ বীমা কোম্পানির ক্ষমতা একজন সাধারণ নাগরিকের তুলনায় অনেক বেশি। চিকিৎসার জন্য ৬০% ব্যাংকরাপ্সির কারণও প্রায়শই হাসপাতালের অমানবিক লাভের ক্ষুধা। জিন পুল (Jean Poole) নামে এক চিকিৎসা- বিলের উকিলের কাছে এসেছিলেন এক বৃদ্ধা। সঙ্গে দুটি বিল। একটি ২৫০০০ আর একটি ৬৫০০০ ডলারের। প্রথমটি এসেছে হাসপাতাল থেকে যেখানে বৃদ্ধার ৬৮ বছরের স্বামীর চিকিৎসা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় বিলটি নার্সিং হোমের। আমেরিকায় নার্সিং হোম হল পুনর্বাসন কেন্দ্র যা সাধারণ বীমাকোম্পানির আওতায় পড়ে না। এক মধ্যবিত্ত আমেরিকানের কাছে $ ৯০,০০০ এক অকল্পনীয় অঙ্ক। বীমা কোম্পানি দেবে $ ২২,০০০ বাকি $ ৬৩,০০০ দিতে হবে বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার কোনো সামর্থ্য নেই ঐ অঙ্কের টাকা পরিশোধের। একমাত্র উপায় ব্যাংকরাপ্সি। বৃদ্ধার সাহায্যে এগিয়ে আসেন জিন পুল, অবশ্য তাঁর পারিশ্রমিক কত তা জানা নেই। তবুও বৃদ্ধার কাছে এছাড়া আর কোনো রাস্তাও ছিল না। অনেকের কাছে এ রাস্তাও থাকে না। যাক সে কথা। মিস্ পুলের সামান্য তদন্তে দেখা গেল যে বিলের অধিকাংশই ভুয়া। অকারণে অন্যায় বিল তৈরী হয়েছে যাতে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করা যায়। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বীমা কোম্পানি নয় সরকারি মেডিকেয়ারকে এই বিপুল অর্থ দিতে হত। মিস পুলের তদন্ত শেষে দেখা গেল যে বৃদ্ধাকে সর্বসাকুল্যে মাত্র একশ চৌষট্টি ডলার নিরানব্বই সেন্ট অর্থাৎ $১৬৪.৯৯ দিতে হবে। ভেবে দেখুন চুরির মাত্রা। $৬৩,০০০ এর অংক নেমে হল মোটে $১৬৫! এ গল্প কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন চরম উদাহরণ নয়। এমন ঘটনা ঘটে হামেশাই। যে রোগীর মিস পুলের মত দক্ষ উকিল নিযুক্ত করা সম্ভব নয় ভাবুন তাঁর দশা! কাকে দায়ী করবেন এমন প্রতারণার জন্য? শুধু বীমা কোম্পানিই নয়, হাসপাতালকেও। সর্বোপরি দায়ি করা প্রয়োজন হৃদয়হীন কর্পোরেট সংস্কৃতিকে। সেন্টার ফর হসপিটাল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের পরিচালক জেরার্ড অ্যান্ডারসন (Gerard Anderson)-এর মতে, ''এই ধরনের হাসপাতাল বিল অর্থহীন। এই চার্জগুলি নির্ধারণ প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে হয় না, বাজারের চালিকা শক্তির ভিত্তিতে হয় না, কেবল হাসপাতালের সি.এফ.ও-র খেয়ালখুশির ভিত্তিতে হয়।''

এবারে বলি আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার আর এক দিকের কথা। ইমার্জেন্সি কেয়ার। আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সেরা অংশের মধ্যে অন্যতম এর ইমার্জেন্সি কেয়ার। আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইমার্জেন্সি রুমে (ই.আর) যেতে হলে লাগে কেবলমাত্র একটি ফোন নম্বর-৯১১। আমেরিকার যে কোন প্রান্তে নিমেষের মধ্যে হাজির হবে অ্যাম্বুলেন্স আর প্যারামেডিক। সাথে থাকবে পুলিশের গাড়ি। দুর্ঘটনা রাস্তায় হলেও পুলিশ বাকবিতন্ডা শুরু করবে না এই নিয়ে যে, ঘটনা কোন পুলিশের এলাকায়। প্যারামেডিক আহত ব্যক্তিকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে এক মুহুর্ত দ্বিধা করবে না। এমন যদি কখনও শোনা যায় ঐ পুলিশকর্মীর এবং প্যারামেডিক দেরী করেছেন তো তাঁদের সাংঘাতিক শাস্তির সম্ভাবনা আছে। এছাড়া কোনো হাসপাতাল ইমার্জেন্সিতে আসা কোনো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এমন ঘটনা ঘটলে সেই হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়।

এমন এক অভাবনীয় মানবিক ব্যবস্থা কিন্তু নিখুঁত নয়। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ওভার-ক্রাউডিং অর্থাৎ ঠাসাঠাসি অবস্থা অনেকক্ষেত্রে গুরুতর রোগীর চিকিৎসার বিলম্ব ঘটায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে রোগীকে গড়ে প্রায় ৪৮ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় যথাযথ ওয়ার্ডে বেড পেতে—পড়ে থাকতে হয় ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। এর কারণ কেবল রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, ইমার্জেন্সি বিভাগের ক্রমাগত হ্রাস। অ্যাম্বুলেন্সের প্যারামেডিকের সাথে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি এবং ট্রমা সেন্টারের ডাক্তারের তথ্য আদানপ্রদান বলবৎ না হওয়ায় রোগীর হয়রান। ফলস্বরূপ রোগী ইমার্জেন্সি বিভাগে না গিয়ে হাজির হন ট্রমা সেন্টারে, বা উল্টোটা। এর কারণ প্যারামেডিকের প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশনের দেশব্যাপী স্ট্যান্ডার্ডগুলি বেশ নিম্নমানের। এছাড়াও ইমার্জেন্সি এবং ট্রমা কল গ্রহণ করার মত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরও অভাব। এরও কারণ সেই বীমা ব্যবস্থা। যেহেতু ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হতে রোগীর বীমার প্রয়োজন নেই এবং কোনো হাসপাতাল ইমার্জেন্সি রোগীকে প্রত্যাহার করতে পারে না, তাই ইমার্জেন্সিতে যাঁরা আসেন তাঁদের বেশ কিছু অংশের কোনো বীমা নেই। ফলে চিকিৎসার দায় অর্থাৎ মেডিকাল লায়াবিলিটি ডাক্তারদের ওপর পড়ে। বীমা না থাকায় ডাক্তাররা তাঁদের 'লায়াবিলিটি ইন্সিওরেন্স'ও ব্যবহার করতে পারেন না, ফলে ভুল চিকিৎসা করে ফেললে ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর বিপাকে পড়েন। ২০১০ সালের 'ওবামা কেয়ার' এই ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করলেও তা এখনও কার্যে পরিণত হয়নি। ২০১৪ সালে কার্যকরী হবে বলে বলা হয়েছে। আর একটি সমস্যা হল প্রাকৃতিক বা মানব-সৃষ্ট দুর্যোগে সাড়া দেবার মত প্রস্তুতির এখনও অভাব রয়ে গেছে। যে পরিমাণ অর্থ ইমার্জেন্সি কেয়ারে প্রয়োজন তার খুবই সামান্য অংশ বরাদ্দ করা হয়। ফলে সবসময় যথাযথ মানের চিকিৎসাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সবার উপর যেটি সবচেয়ে দুঃখজনক এবং উপেক্ষিত তা হল পিডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি কেয়ার অর্থাৎ শিশু চিকিৎসা সংক্রান্ত ইমার্জেন্সি। সমস্ত ইমার্জেন্সি রোগীর ২৭ শতাংশ শিশু, কিন্তু দেখা গেছে যে কেবলমাত্র ৬ শতাংশ হাসপাতালে শিশুর ইমার্জেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।

সুতরাং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর হলেও আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রয়েছে অসংখ্য ফাটল। এ সবই নিরাময় সম্ভব যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মানবদরদি না হলেও মানবতাবাদী চিকিৎসকের অভাব নেই। এমনই এক চিকিৎসকের প্রদত্ত পথ অনুসরণ করার কথা বলেছেন ডা. অতুল গাওয়ান্ডে (Atul Gawande) যিনি হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন (Bill Clinton)-এর স্বাস্থ্য নীতির উপদেষ্টা। ডা. গাওয়ান্ডে ক্যামডেন নামক নিউ জার্সির একটি কুখ্যাত শহরের এক জনদরদী ডাক্তারের কথা বলেন। ডাক্তারের নাম জেফ ব্রেনার (Jeff Brenner)। ডা. ব্রেনার দেখলেন যে যাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সবচেয়ে বেশি খরচ করা দরকার, তাঁরাই সবচেয়ে খারাপ যত্ন পান। উনি ঠিক করলেন যে এঁদের যদি প্রথম থেকে প্রাথমিক যত্ন দেওয়া যায় তবে তা শুধু এঁদেরই সাহায্য করবে না, পুরো ক্যামডেন শহরকে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থা অর্থ সংরক্ষণেও সহায়তা করবে যা ক্যামডেনের উন্নতির খাতে ব্যয় করা যায়। ডা. ব্রেনারের গোটা টিমে আছে নার্স এবং সমাজসেবী। তাঁর গোটা দল মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসায় নামে এবং মাত্র তিনবছরে হাসপাতালে ভিজিটের সংখ্যা গড়ে বছরে ৬২ থেকে কমিয়ে ৩৭-এ নিয়ে আসেন। হাসপাতাল বিলও গড়ে $১.২ মিলিয়ন থেকে কমে $৫,০০,০০০-এ নেমে আসে। ডা. গোয়ার মতে ডা. ব্রেনারের ব্যাপক চিকিৎসা পদ্ধতিই ভবিষ্যতের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আদিরূপ। ''ওবামাকেয়ার'' ডা. ব্রেনারের চিকিৎসা পদ্ধতিকে হুবহু নকল না করলেও এর বেশ কিছু ব্যবস্থা ঐ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরী বলেই ধারণা। যেমন প্রাথমিক কেয়ারের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১২-র সুপ্রিম কোর্টের রায় যখন ''ওবামা কেয়ার'' সাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে, তখন ডা. ব্রেনারের উল্লসিত বক্তব্য স্মরণযোগ্য। উনি বলেন, ''আজকের জয় কেবল ১৫০০০ ক্যামডেনবাসীরই জয় নয়, এ ৫০ মিলিয়ন আমেরিকানের জয়।'' শ্রীমতী পাল ভৌমিক তাঁর প্রবন্ধেও ঐ ৫০ মিলিয়ন আমেরিকানের কথা লিখেছেন। ''ওবামাকেয়ার'' কিছু না করলেও ঐ ৫০ মিলিয়ন বীমাহীন মানুষের অনেক বেশি সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করছে। এই বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির যুগে, তাই বা কম কি?

রাজা ভট্টাচার্য, আমেরিকা।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে বিশেষ সংকলন

প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য : কুড়ি টাকা। কপির জন্য পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

ঠিকানা (সুখের) দিলে না বন্ধু

সুখ অতি সহজ সরল, কাননের প্রস্ফুট ফুলের মতো,
শিশু আননের হাসির মতন—**রবীন্দ্রনাথ**

প্রিয় সম্পাদক, স্বাস্থ্যের বৃত্তে,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১২- জানুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত মনোবিদ রুমঝুম ভট্টাচার্যের 'সুখের ঠিকানা' প্রসঙ্গে এই চিঠি। সুখ যদি কেবল নাকছাবিতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে তবে তা হারিয়ে গেলে নিশ্চয় সে সুখহীনতা পীড়া দেবে। তাই সুখের উপাদান নাকছাবি ছাড়িয়ে নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে পারলে ভালো হয়। যাতে করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা সুখ উপভোগের বহুমুখী উপাদান ছোট বড় নানান সুখহীনতার ফাঁকগুলি সময় সময় ভরিয়ে দিতে পারে। শ্রীমতি ভট্টাচার্য তাঁর লেখার আঙ্গিকে কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর অণু (পরমাণু!) পরিবারকেন্দ্রিক সুখের যে খন্ডিত ধারণা দিতে চেয়েছেন তা পূর্ণাঙ্গ নয় বলেই আমার মনে হয়েছে। সুখের মতো একটা বহুব্যাপ্ত মানসিক উপলব্ধি বা অনুভব সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব একটা আশ্চর্য জগত রয়েছে; যা সামগ্রিকতা দাবী করে। কারণ সুখ কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণের রসায়নের দ্বারাই নির্ধারিত হয় না; এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে পরিবার বা প্রতিবেশীদের হরেকরকম মানবিক গুণাবলী ও সামাজিক পরিকাঠামোর অন্য সব উপাদানের নানান মিথস্ক্রিয়া। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে দাম্পত্য সুখ-শান্তির পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক সুখ ও সম্মান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। অবশ্যই দাম্পত্যসুখকে হেলাফেলা করছি না। আসলে বোধহয় সুখ বিশেষ কোনো একটা ছক মেনে চলে না। তার চলার ভঙ্গি নির্ভর করে মানুষের আত্মোপলব্ধি ও মননের উপর। পরিসংখ্যানের তত্ত্বকে এড়িয়ে গিয়ে এখানে বোধহয় সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও আনন্দ-বেদনার উপলব্ধির ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

বার্ট্রান্ডি রাসেল তাঁর The Conquest of Happiness (বাংলা অনুবাদ কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সুখের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, ''সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি মনস্তত্বের মধ্যে নানা প্রকার অতৃপ্তির কারণ খুঁজে দেখতে হবে। এই ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব আবার অনেকাংশে সমাজ ব্যবস্থার পরিপূরকের উপর নির্ভরশীল।'' তিনি আরও বলেছেন, ''দৈনন্দিন কাজে ডুবে গিয়ে নিজের অহং ভুলে যেতে না পারলে সুখী হওয়া যাবে না। কোনো কোনো হতভাগ্যের আত্ম-নিমগ্নতা এমনই গভীর যে, অন্য কোনও উপায়ে তা থেকে তাদের উদ্ধার করা যাবে না। তাদের তৃপ্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে বাইরের শৃঙ্খলার উপর ভরসা। তাদের নিজের সমাজের প্রতি যে আকর্ষণ এবং যে অব্যবস্থা দূর করবেন বলে তিনি দাঁড়ান, তার পরিবর্তে তার মধ্যে আত্মপ্রেম জেগে ওঠে এবং তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন শুধু নিজের জন্যে।''

সমাজ-মনস্ক ব্যক্তিদের কাছে সুখ বিষয়টা যদি এরকম একটা খন্ডিত বিষয় হয়ে পড়ে তবে তা খুব বেদনাদায়ক। যদিও আশেপাশে চোখ পাতলে সুখ বজায় রাখার এমন সব অপচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যা চোখের সুখ বা মনের আরামকে অনেক সময়ই অস্বস্তিতে ভরিয়ে দেয়।

ধরা যাক না হয় একমাত্র চিকিৎসক পুত্রের পিতা প্রতাপাদিত্য বসুর প্রতাপ প্রবল। পুত্রবধূটিও চিকিৎসক। পুত্রবধূ কর্মস্থলে যাবার পথে মাঝ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে কিছুক্ষণের জন্য বাপের বাড়িতে ঢুকলেন। পরনের শাড়ি বদলে জিনস-টপ বা চুড়িদার পরলেন এবং সিঁথি এবং কপালের সিন্দুরের টিপকে মাইক্রোস্কোপিক করলেন। কাজ শেষে ফেরার পথে আবার পুরানো পোষাকে সজ্জিত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরলেন। এই যে সুখ-শান্তি বজায় রাখার কৌশলী প্রচেষ্টা তাকে কী সংজ্ঞা দেওয়া যায়? সংযত ব্যবহার! না, লেখিকার সাবধানবাণী মেনে আমি ঝপ করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাইছি না। ঘটনাটির পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্য বিষয়ের ব্যাপ্তিকে ছকের বাইরে এনে ফেলা যাতে করে সমস্যা বা ঘটনা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা করা যায়।

তকমা কখন ভুল আর কখন ঠিক? সুকান্ত বাদ্যকরের কথা বলি। তবে আমি 'বাদ্যকর' লিখলেও উনি অবশ্য পদবি ব্যবহারের বিরুদ্ধে। 'হাম দো হামারা দো'র উচ্চবিত্ত পরিবার। একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করেন। দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্রিয়াকর্মে যুক্ত। সমাজে ও ছাত্রছাত্রী মহলে বেশ জনপ্রিয়। ওঝা-গুণিন, ভূত-ডাইনি, শ্রাদ্ধ-শান্তি, পুরুত-ডাকা বিবাহ বয়কট, বরপণ মায় নারীর শাঁখা-সিন্দুর ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বহু পরিশ্রম করেছেন একদা। পোস্টারিং-এ প্রচুর সময়, কাগজ, রঙ খরচ করেছেন। দান ধ্যানেও সিদ্ধহস্ত। এইসব কাজ করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক যুবক-বৃদ্ধও যোগ দিয়েছেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ এ হেন সুকান্তবাবু পিতৃশ্রাদ্ধে মস্তক মুন্ডন করেন বা শাঁখা-সিন্দুরের পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন বা তাঁর গৃহপ্রবেশের যজ্ঞানুষ্ঠানের ভস্মতিলক এঁকে ঘুরে বেড়ালেন বা ছেলেমেয়ের বিয়েতে মোটা টাকা পণ দিলেন বা নিলেন। আর এ জাতীয় ঘটনাগুলির ভিত্তি যদি অনুমান না হয়ে বাস্তব হয় এবং পরিস্থিতির সব দিক বিবেচনা করে যদি সুকান্তবাবুর সহযোদ্ধারা (এবং যারা সহযোদ্ধা নয় তারাও) বাদ্যকর মশাইকে 'পাতি ধান্দাবাজ' বলে তকমা দেন তাহলে তাকে Labelling করবেন কীভাবে? এই বিচারের ভার না হয় সমাজবন্ধু ও মনোবিজ্ঞানীদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক।

ধন্যবাদান্তে
স্নেহাশিস পাত্র
কোন্নগর, হুগলি, ৭১২২৩৫।

লেখিকার উত্তর : মাননীয় পাঠক মহাশয়, প্রথমেই জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনি মনোযোগ সহকারে 'সুখের ঠিকানা' নামক লেখাটি পড়েছেন ও তার মূল্যায়নের শুভ চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই জানাই লেখাটির বিষয় বস্তু অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় শুরুতেই জানানো হয়েছে। বিষয়টি হল 'দাম্পত্য কলহে আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের ভূমিকা'। 'সুখ নেইকো মনে নাকছবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে'—কখনো কখনো অতি সামান্য বিষয়ের জন্যও অনেকেই সুখ তথা শান্তিহীনতায় ভোগেন। এর পিছনে চিন্তার ও বিশ্বাসের ভূমিকাই এই লেখার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সুখের সামগ্রিক ধারণা ও বৃহত্তর সমাজে নিজেকে ব্যাপ্ত করে সুখ আহরণের বিভিন্ন উপায় ও কী কী বিভিন্ন রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়ায় সুখ ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে সে আলোচনা ভিন্ন পরিসর দাবী করে। উনি নিজেও স্বীকার করেছেন, সুখের চলার ভঙ্গী নির্ভর করে আত্মোপলব্ধি ও মননের ওপর। এই মনন অনেকাংশে পরিচালিত হয় আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা। এই লেখাটির মাধ্যমে ব্যক্তির মূল যে পরিবার সেই পরিবারের শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তা ও বিশ্বাসের মূল্যায়ণ করা হয়েছে। তবে লেখাটির নামকরণ পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকলে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

মানুষের নাগালের বাইরে ওষুধ

মাননীয় সম্পাদক, স্বাস্থ্যের বৃত্তে,

ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধ ''প্রয়োজনীয় ওষুধ ভারতের বেশীর ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে কেন ও কি করা যায়?'' (স্বাস্থ্যের বৃত্তে, ডিসেম্বর ২০১২- জানুয়ারি ২০১৩ সংখ্যা ও ফেব্রুয়ারি - মার্চ ২০১৩ সংখ্যা) খুব ভাল লেগেছে। এটি প্রকাশের জন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। সত্যিই ডাক্তাররা জেনেরিক নামে ওষুধ লিখলে রোগীর উপকার। বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে চিকিৎসাবিজ্ঞান জেনেরিক নামে ওষুধ সম্পর্কীয় সমস্ত চর্চা করে। প্রেসক্রিপশন লিখতে গিয়ে একগাদা ব্র্যান্ড নাম, কোম্পানির নাম, তাদের প্রতিটার দাম, বাজারে পাওয়া যায় কিনা—এসব তথ্য দিয়ে অকারণে ডাক্তারের অনেকটা মনোযোগ ও স্মৃতিভান্ডারের ক্ষমতা খরচ করতে হয়। ব্র্যান্ড নামে প্রেসক্রিপশন লিখতে বা পড়তে গিয়ে ভুল হতে পারে, কেননা সব ব্র্যান্ডের নাম সব ডাক্তার জানেন না, জানা সম্ভব নয়, ফলে এক ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অন্য ডাক্তার অনেক সময়ে বুঝে উঠতেই পারেন না। ফলে রোগীর নানা ক্ষতি হয়ে যায়। রোগীকে শুধু শুধু অনেক বেশি দাম দিয়ে ওষুধ কিনতে হয়, অথচ তিনি বুঝতে বা জানতেই পারেন না ঠিক একই জিনিস অনেক কম দামে পাওয়া সম্ভব। ক্রেতা হিসেবে তাঁর ন্যূনতম অধিকার হলো বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির একই পণ্যের মধ্যে দামের তুলনা করে কোনও একটি বেছে নেবার স্বাধীনতা, সেটি ওষুধের কোম্পানিরা ব্র্যান্ড নামের চাতুরিতে এড়িয়ে যায়। এতে ওষুধ কোম্পানির লাভ বিস্তর, কিন্তু ওষুধের মতো প্রাণদায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে সরকার কি করে এইটা মেনে নেন বোঝা দুষ্কর।

লেখাটি পড়ে উপকৃত হয়েছি, এইটাই প্রধান কথা। কিন্তু তারপরে দু-একটা ক্ষুদ্র কথা থাকে, ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য আমার প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সে কথাগুলো এখানে সাহস করে বলতে পারছি। ডা. ভট্টাচার্য ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার বার বলেছেন 'ব্যাগ-হাতে বাবু'। কথাটা বড় বেশি কানে বাজে। অন্যকে এরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার একটা সাংস্কৃতিক ধারা আমাদের আছে - উড়িষ্যাবাসীদের 'উড়ে', বিহার-উত্তরপ্রদেশের মানুষদের 'খোট্টা' - এইরকম বলার চল আছে। এটা কিন্তু অন্য মানুষকে আহত করে, বিচ্ছিন্ন করে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করছেন, তাঁদের নিজেদের রুটি-রুজির স্বার্থে তাঁরা কোম্পানির শেখানো বুলি বলবেন, শেখানো পথে চলবেন—সেটাই স্বাভাবিক। ডাক্তারদের মতো তো তাঁরা রোগীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার সংস্থান করছেন না। বিজ্ঞান-সম্মত ওষুধ-নীতি চিকিৎসানীতির আলোচনা - আন্দোলনে অনেক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বা তাঁদের সংগঠন, এগিয়ে আসেন, এটাও আমি দেখেছি। সেটা তাঁদের জীবিকার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। সুতরাং তাঁদের এরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কোনমতেই পাওনা নয়। 'ব্যাগ-হাতে বাবু' কথাটা একবার নয়, বারবার উচ্চারিত হয়েছে—এটা দুঃখজনক।

এছাড়া দু-একটা কথা। আশা করব আমার ছোটো মুখে বড় কথাতে ডা. ভট্টাচার্য বা পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলী রাগ করবেন না। প্রবন্ধে লেখা হয়েছে - ''বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে অল্প কিছু নির্বাচিত ওষুধ দিয়ে **বেশীর ভাগ** অসুখের চিকিৎসা সম্ভব।'' (নিম্নরেখ বর্তমান পত্রলেখকের) এবিষয়ে আমি একমত। কিন্তু তার পরেই ডা. ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বাস করে অত্যাবশ্যক ওষুধ-তালিকা (Essential Drug List)- এর বাইরের ওষুধের জন্য অর্থব্যয় অর্থের অপরাধমূলক অপচয়।'' এখানে একটু অসুবিধা আছে। ভারতের অত্যাবশ্যক ওষুধ-তালিকা ২০১১ (National List of Essential Medicines of India, 2011) খুললে দেখা যাবে, ৩৪৮-টি ওষুধের তালিকা দেওয়া আছে। সেখানে প্রয়োজনীয় ওষুধ সবগুলো আছে কি? মনে হয়, নেই। একটা দুটো উদাহরণ দেবার চেষ্টা করি, অবিশেষজ্ঞর উদাহরণে ভুল হলে মার্জনা করবেন। এই লিস্টে 'সোরালেন' (Psoralen) গোত্রের ওষুধের উল্লেখ নেই, কিন্তু যতদূর শুনেছি এটি শ্বেতীর জন্য ব্যবহৃত প্রথম ধাপের ওষুধ। আবার ভিটামিন-এ মলম বা ভিটামিন-এ'র থেকে তৈরি কিছু মৌল (Vitamin A derivatives) নাকি ব্রণর একদম প্রথম ওষুধ - সেটাও এই তালিকায় নেই। এ দুটোর কোনটাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মডেল অত্যাবশ্যক ওষুধ-তালিকা, WHO Model List of Essential Medicines, 17th list (March 2011)-তেও নেই। তাহলে যে ডাক্তারবাবু শ্বেতীর জন্য 'সোরালেন' ব্যবহার করবেন না, তাঁর ওপর ন্যায্য অভিযোগ হবে, তিনি এই রোগের স্বীকৃত প্রথম চিকিৎসাটাই করলেন না। আর 'সোরালেন' ব্যবহার করলে কি অভিযোগ হবে যে তিনি 'অর্থের অপরাধমূলক অপচয়' করছেন? বা ব্রণ, বোধকরি বিশ্বের সর্বপেক্ষা বেশি দেখা যায় এমন চর্মরোগ। তাতে কি চিকিৎসক —''অত্যাবশ্যক ওষুধ-তালিকায় নেই, তাই প্রথম ওষুধ ভিটামিন-এ বা ভিটামিন-এ ডেরিভেটিভ দেব না, যতই তা বইতে প্রথম ওষুধ বলে লেখা থাক না কেন''—বলে দেবেন? মনে হয় না। হয়তো ব্রণ বা শ্বেতীকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ''basic health care system''-এ জরুরী বলে মনে করেনি, বা এগুলিকে ''priority conditions'' এর অন্তর্ভুক্ত করেনি। তা বলে ''... অত্যাবশ্যক ওষুধ-তালিকা (Essential Drug List)- এর বাইরের ওষুধের জন্য অর্থব্যয় অর্থের অপরাধমূলক অপচয়''—এটা বলা ঠিক হল কি? ডা. ভট্টাচার্য নিশ্চয়ই এই সমস্যার কথা ভেবেছেন, একটু আলোকপাত করলে ভাল হয়।

শেষ কথাটা অবশ্য লেখককে যতটা ঠিক ততটাই পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে বলছি। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ, যেটা স্বাস্থ্যের বৃত্তে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, তার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে যে সমস্ত উপাদানের ওপরে একটি ওষুধের দাম নির্ভর করে তার তালিকা ও বিবরণ। সেটার উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট ছিল, কেন যে লেখক কাঁচা মাল খরচ, উৎপাদন খরচ, প্যাকেজিং খরচ, টেস্টিং খরচ, লাভ, মার্কেটিং খরচ, প্রমোশন খরচ, কর ইত্যাদির প্রতিটি ধরে ধরে আলোচনা করলেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এতে লেখার কলেবর অকারণে বেড়ে গেল, আর আমার মতো সাধারণ পাঠক ধৈর্য হারালেন অনেকটাই। ফলে কিভাবে কোন কোন পদক্ষেপে সাময়িকভাবে মানুষকে রিলিফ দেওয়া সম্ভব, আর সরকারের ওপর কী কী বিষয় নিয়ে চাপ দেওয়া উচিৎ, লেখার সেই সূচিমুখের ধারটা যেন খানিক ভোঁতা হয়ে গেল। সম্পাদনা করতে গিয়ে এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখলে সম্পাদকরা একটি ভাল লেখাকে আরও ভাল করে তুলতে পারতেন - এটুকু আপসোস রয়ে গেল।

—অহনা মল্লিক, কলকাতা ৭০০ ০২৬।

অহনা মল্লিককে ধন্যবাদ লেখাটি মনোযোগের সাথে পড়ার জন্য ও তার সুচিন্তিত মতামতের জন্য। এখানে আমার মতামত দিচ্ছি।

ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য

১। যদি একজন মানুষও আমার লেখা থেকে আহত হয়ে থাকেন তাদের কাছ থেকে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। লেখাটি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে নয়, আমাদের দেশে চলা একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমাদের দেশে ওষুধ ব্যাবসার ক্ষেত্রে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ (MR) রেখে ওষুধের মার্কেটিং-এর এই ব্যবস্থাটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিশেষত MR -রা কতটা বলতে পারেন এবং তার কতটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবিষয়ে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অথচ এ বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা মানুষের জীবন মরণ নিয়ে কাজ করেন। যেদেশে ডাক্তাররা অবৈজ্ঞানিক ওষুধ লিখলে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার বিধি নেই যেখানে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এর ফল ভোগ করতে হয় এমনকি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদেরও। বহু রিপ্রেজেন্টেটিভকে অবৈজ্ঞানিক ওষুধ খেতে ও পরিবারের লোকদের খাওয়াতে দেখা যায়। একথা ঠিকই চাকরির স্বার্থে তাঁদের অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। লেখার মূল ধারাটা যদি লক্ষ্য করেন বুঝবেন মূলত সেই ডাক্তারদের ইঙ্গিত করা হয়েছে যাঁরা MR-দের কথায় বেশি ভরসা করেন। তাছাড়া ডাক্তারদের ওষুধ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানানোর সরকারী ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথাও বলা হয়েছে। ডাক্তার ওষুধ কোম্পানীর আঁতাত ঐ অংশের মূল উপজীব্য। ডাক্তারদের সেই অংশ যাঁরা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে ব্যক্তিস্বার্থে সম্পর্ক তৈরী করেন তাঁদের স্বরূপ উন্মোচন করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ডাক্তারদের এই অংশ MR-দের ঐ ভাবে দেখেন সেটাই বলতে চাওয়া হয়েছে। MR-দের পেশার মহত্ত্ব আজ কোম্পানি ও ডাক্তারদের পাল্লায় কোথায় নামছে সেটা পরে আলোচনা করা যাবে। আবার ভাববেন না সবাই এই সব দলে পড়েন। 'ব্যাগ হাতে বাবু' বলে MR-দের কটাক্ষ করতে চাওয়া হয় নি, কটাক্ষ করা হয়েছে ডাক্তারদের।

২। 'অর্থের অপব্যয়' কথার মানেটা পত্রলেখক বুঝতে ভুল করেছেন। এখানে আর্থিক সম্পদের অপচয় বলতে চাওয়া হয়েছে। মূল ইংরেজি অংশটি 'Adoption of Standard Treatment Guidelines to discourage "Luxury drugs". WHO believes that expenditure on preparations which are not in EDL is a criminal waste of resources.'। সূত্র - documentation by Dr. Samit Sharma, Collector & Distric Magistrate Chittorgarh (Rajasthan);। লেখাটি "A Lay person's Guide to Medicines" by S. Srinivasan অনুসারে লেখা। যে দুটি উদাহরণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন সেগুলি কেন EDL-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি সেটা ওনার প্রশ্ন নয় বলে যে প্রসঙ্গে আলোচনা না করে আমার লেখার বিষয়ে আলোচনা নিবন্ধ করছি। 'লাক্সারি ড্রাগস', রিসোর্স, ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতেই পারে তবে তাতে লেখা আরও দীর্ঘায়িত হবে। সাধারণভাবে বলা যায় আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য হবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া রোগীকে এই ধরনের ব্যয়বহুল চিকিৎসা দেওয়ার আগে চিকিৎসার ফলাফল সম্বন্ধে রোগীকে বলে নেওয়া উচিৎ। ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে WHO-এর বক্তব্য - 'Rational use of medicines requires that "patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for a an adequate period of time, and at the lowest cost to them and their community". The overuse, underuse or misuse of medicines result in wastage of scarce resources and widespread health hazards.' ওষুধের দাম সম্বন্ধে WHO-এর বক্তব্য 'When making cost comparisons between medicines, the cost of the total treatment, not just the unit cost of the medicine, is considered.'। কাজেই এধরনের ওষুধ লেখা বা কেনা অপরাধ নয়, অপরাধ এগুলির পেছনে দেশীয় সম্পদের অপব্যবহার। কারণ দেখা যায় DPCO-র অন্তর্ভুক্ত ওষুধগুলি তৈরি করতে কোম্পানিরা আগ্রহী হয় না, অথচ হাজার হাজার অনাবশ্যক ওষুধ বিপুল পরিমাণে তৈরী হচ্ছে। অর্থসম্পদের অপচয় প্রসঙ্গে বলা যায় আমাদের মতো দুর্বল অর্থনীতি যেখানে মানুষের নাগালের বাইরে অত্যাবশ্যক ওষুধ যা দিয়ে অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব তার উৎপাদন ও বন্টনের দিকে সরকারের নজর দেওয়া এবং ওষুধ উৎপাদকেরা যাতে সেগুলি বেশি করতে করে উৎপাদন করে সেটি দেখা। লেখাটিতে শুধু অর্থব্যয় না লিখে অর্থের অপব্যয় লেখার কারণটা বোঝার চেষ্টা করলেই পরিষ্কার হবে।

৩। অহনা দেবী আগে থেকেই বোধহয় কিছুটা বুঝেছিলেন যে ওষুধের ব্যবসায় পুকুর চুরি হয়। বেশির ভাগ লোকের ধারণা (ডাক্তার, শিক্ষিত লোকের মধ্যে বেশি) কোয়ালিটি বজায় রাখতে গিয়ে ওষুধের দাম বাড়ে। আসলে ওষুধ উৎপাদন খরচ এবং MRP-র মধ্যে থাকে বিস্তর ফারাক। উৎপাদন পরবর্তী খরচ (MAPE) বেশি দেখিয়ে উৎপাদন খরচ বেশি দেখানোর সুযোগ তো সরকারী নীতিই করে দিচ্ছে। ব্র্যান্ডের পৃষ্ঠপোষকদের মুখ বন্ধ করতেই বিভিন্ন খাতে খরচ প্রসঙ্গে আলোচনা এক্ষেত্রে এতটা দীর্ঘ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা এই মিথের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যুক্তির হাতিয়ার সরবরাহ করাই বর্তমান লেখকের মূল উদ্দেশ্য।

✠ নিমপাতা করলা খেয়ে সুগার কমে না।